প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-2 :Culture, Socialization and Social Control

প্রথম মূদ্রণ : এপ্রিল, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-2 :Culture, Socialization and Social Control

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences,
Netaji Subhas Open University (NSOU)
Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt. of Sociology,
University of Calcutta
Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology,
University of Calcutta
Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU
Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology
NSOUR
Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology,
Presidency University
Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology,
Vidyasagar University
Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU
Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

: Course Writer :
Dr. Kumkum Sarkar
Associate Professor in Sociology
NSOU

: Course Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Chaudhuri
Assitant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-2 :Culture, Socialization and Social Control

পর্যায়

2

একক 1	❑	ব্যক্তি ও সমাজ : সংস্কৃতি ১ সামাজিক উৎপত্তি ও উপাদানসমূহ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ - সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতি ও সভ্যতা	7-16
		অনুশীলনী	
একক 2	❑	বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি, রীতি এবং মূল্যবোধ, মতাদর্শ ও বিজ্ঞান	17-26
		অনুশীলনী	
একক 3	❑	সামাজিকীকরণ : প্রক্রিয়া এবং মাধ্যমসমূহ - পুনর্সামাজিকীকরণ আত্মসত্ত্বার বিকাশের তত্ত্বসমূহ - সামাজিক কাঠামো	27-33
		অনুশীলনী	
একক 4	❑	সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রকৃতি, এবং মাধ্যমসমূহ, আইনানুসরণ এবং বিচ্যুতি ঃ বিচ্যুতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা	34-48
		অনুশীলনী	

প্রথম পত্র শিরোনাম : সমাজতত্ত্বের পরিচয়

শিরোনাম : পর্যায় / মডিউল - ২ : সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ

উদ্দেশ্য ঃ

এই মডিউলটির আলোচনা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন সেগুলি হল, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, সংস্কৃতির অর্থ, তার সামাজিক উৎপত্তি, উপাদান, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের গঠন, সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজে বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও মতাদর্শের স্থান, বিজ্ঞানের গুরুত্ব, সামাজিকীকরণের অর্থ ও প্রকৃতি, বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা, পুনর্সামাজিকীকরণ, আত্মসত্ত্বা বিকাশের বিভিন্ন তত্ত্ব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি, বিভিন্ন মাধ্যম, রীতির অনুসরণ এবং বিচ্যুতি, বিচ্যুতির বিভিন্ন তত্ত্ব ইত্যাদি।

পর্যায় / মডিউলের প্রস্তাবনা ঃ

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণের ধারণা। সমাজের সদস্যরূপে ব্যক্তি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে যে প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে সেটি হল সামাজিকীকরণ। সংক্ষেপে বলা যায়, নিজ গোষ্ঠী তথা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে আত্মস্থ করেই ব্যক্তি সমাজোপযোগী হয়ে ওঠে। অতএব, সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনায় এই দুটি বিষয়ের বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই মডিউলটি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তাই সংস্কৃতি এবং সামাজিকীকরণের মূল ধারণা, প্রকৃতি, মাধ্যম, প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরেছে।

একক 1 ❑ ব্যক্তি ও সমাজ ঃ সংস্কৃতি ঃ সামাজিক উৎপত্তি ও উপাদানসমূহ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ - সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতি ও সভ্যতা

ব্যক্তি ও সমাজ ঃ সংস্কৃতি ঃ সামাজিক উৎপত্তি ও উপাদানসমূহ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ - সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতি ও সভ্যতা।

ব্যক্তি ও সমাজ ঃ

ব্যক্তি সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে কেন্দ্র করেই তার জীবন পরিচালিত হয়। কেবলমাত্র সমাজতত্ত্বেই নয়, সমাজবিজ্ঞানের প্রায় অন্যান্য সব কটি শাখাতেই সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককে বিশ্লেষণের আগ্রহ দেখা গেছে।

প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে সমাজের সদস্য, সমাজের মধ্যেই তার ব্যক্তি-পরিচয় পূর্ণতা পায়। তার ব্যক্তিত্ব, আত্মসত্ত্বা, সমাজের সদস্যরূপে তার ভূমিকা ইত্যাদি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সমাজের পরিবেশে, অন্যান্য মানুষের

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের ব্যাখ্যাই হল সমাজতত্ত্বের প্রথম ও প্রধান কাজ। এমনকি সমাজতত্ত্বের উৎপত্তির বহু আগেও মানুষ এই সম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছে। তার সেই প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্যের সমাজ ভাবনায় দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী তত্ত্বের উৎপত্তি হয় — সামাজিক চুক্তি মতবাদ আর জৈব মতবাদ। এগুলির কোনোটিই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে নির্ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করেছে।

চুক্তি মতবাদ ঃ

যীশুখ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে থেকেই সমাজ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা মনে করেছেন যে বিশেষ কতগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সচেতনভবে সমাজ গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ সমাজ হল মানুষেরই সৃষ্টি। প্লেটোর লেখায় এই অভিমতটি প্রথম গড়ে উঠলেও এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সমর্থক হলেন টমাস হব্‌স, জন লক্ এবং জাঁ-জ্যাক্‌স্ রুশো। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে হব্‌স বলেন যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমাজ পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেরা চুক্তি করে যাবতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করে। চুক্তি-নির্দিষ্ট সার্বভৌম ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯১ তে টু ট্রিটিজেজ অফ সিভিল গভর্নমেন্ট গ্রন্থে লক্‌ও বলেন যে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব জনসাধারণ চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমকে সমর্পণ করেছেন। তবে লক্ মনে করেন চুক্তির আগে থেকেই অতি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠেছিল; চুক্তি সেই পরিবেশকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। রুশোর গ্রন্থ 'সামাজিক চুক্তি'র নাম অনুসারেই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে পরিচিত হয়েছে। তিনিও মনে করেন, সমাজজীবনের হারিয়ে যাওয়া শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মানুষ স্বেচ্ছায় চুক্তি করে 'সাধারণ ইচ্ছা' বা জেনারেল উইলের হাতে নিঃশর্তভাবে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ মনে করেন যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সুরক্ষার জন্যই মানুষ সমাজ গড়ে তুলেছে। চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হল, সমাজ এবং সমাজের সুব্যবস্থাগুলিকে গড়ে তোলার পিছনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে মানুষের নিজেদের মধ্যে অথবা মানুষ ও সরকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি। অর্থাৎ সমাজ মানুষের তৈরি করা প্রতিষ্ঠান, দৈব বা প্রাকৃতিক সৃষ্টি নয়। অতীতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে কিন্তু এই মতবাদের তেমন কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল যে এটি ব্যক্তির বিকাশে সমাজের কোনো ভূমিকাকে স্বীকার করে না বরং মনে করে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই ব্যক্তির চেতনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে, যার ফলে তারা স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে চুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণের জন্য সমাজ গড়ে তুলেছে। সমাজ ও ব্যক্তি কেউই পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথবা একে অপরের পূর্ববর্তী নয়। চুক্তি মতবাদ এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছে।

জৈব মতবাদ ঃ

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাখ্যার এই মতবাদটিও যথেষ্ট প্রাচীন। প্লেটোসহ বিভিন্ন গ্রীক চিন্তাবিদদের লেখায় এই তত্ত্বটির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে এটি জনপ্রিয় হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্লুন্টস্‌লি, স্পেন্সারলার,

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ চিন্তাবিদদের প্রভাবে। জৈব মতবাদীদের দৃষ্টিতে সমাজ একটি জীবদেহ বিশেষ; গঠন এবং কার্যাবলী উভয় দিক থেকেই সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। জীবদেহের মতই সমাজেরও জন্ম বা উৎপত্তি, বিকাশ এবং ধ্বংস সাধন হয়। জীবদেহ যেমন অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত হয়, সমাজ দেহও তেমন গড়ে অসংখ্য মানবসদস্য দ্বারা; জীবদেহের যেমন নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে যেমন সুস্থ জীবদেহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ঠিক তেমনি সমগ্র সমাজ দেহেও গড়ে ওঠে বহুবিধ সমিতি ও সংগঠন। সেগুলির পরিচালনার জন্য গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান বা নিয়মাবলী। এই ভাবে জৈবমতবাদীগণ জীবদেহ ও সমাজদেহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তুলনা এবং আলোচনা করেছেন, ব্লুন্টস্লিসহ কয়েকজন সমাজচিন্তাবিদ সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্রাণীর মস্তিষ্ক, হাত, পা, ফুসফুস ইত্যাদির সাদৃশ্য নির্ণয় করেছেন। সমাজতত্ত্বের জনক কোঁৎ বলেন জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত সমাজে ব্যক্তিসহ বিভিন্ন সংগঠন সমিতি ইত্যাদিও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও নির্ভরশীল হয়ে কাজ করে চলে। অনেক চিন্তাবিদ্ জীবদেহ ও সমাজদেহের সাদৃশ্য বর্ণনায় জন্ম, যৌবন, প্রবীনতা, বার্ধক্য, মৃত্যু বা বিনাশ ইত্যাদি ধারণার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

সজীব প্রাণী ও সমাজের সাদৃশ্য কল্পনায় কখনও আবার দেহের পরিবর্তে গুরুত্ব পেয়েছে মনের ধারণা। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থ থেকে শুরু করে, হেগেলের ভাববাদী চিন্তাধারায় এবং আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগালের বক্তব্যে সমাজ প্রসঙ্গে এক 'যৌথ মনের' কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ নিজেই এমন একটা মন যে মনের অংশীদার সমাজের সব সদস্য।

সমাজের সঙ্গে জীবদেহ বা মনের সাদৃশ্য কল্পনা সমাজসংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাবিত করেছে। প্লেটোর 'রিপাবলিক' থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত এই প্রভাব কার্যকরী ছিল। নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী চিন্তাধারায় রাষ্ট্রকে 'পিতৃভূমি' রূপে এবং ব্যক্তিকে তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ'ছাড়া রাষ্ট্র তথা সমাজের বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যায় মানবীয় আচরণের তুলনা করা হয়। জৈব মতবাদে ব্যক্তিকে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র এবং সমাজকে সুবিশাল ও মহান বিবেচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে সমাজ ব্যতীত ব্যক্তি অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির জীবনে সমাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক পারস্পরিক। একটিকে ছাড়া অপরটি অর্থহীন। জৈব মতবাদ ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের কেবল মাত্র একটি দিক অর্থাৎ ব্যক্তির সমাজ নির্ভরতার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে, ব্যক্তি ছাড়া যে সমাজ অর্থহীন, সে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেনি। বর্তমানে জৈব মতবাদ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কের বাস্তব উদাহরণ ঃ

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের প্রকৃতিকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। এই উদাহরণগুলি ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করে।

ক্যাসপার হাউসারের উদাহরণ ঃ

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ন্যুরেমবার্গ শহরে যখন সতেরো বছরের তরুণ ক্যাস্পার হাউসারের সন্ধান পাওয়া যায় তখন সে ভাল করে হাঁটতে বা কথা বলতে পারতো না, কিছু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতো। তার মনও ছিল একেবারেই শিশুর মতন; জড় পদার্থকে দেখে প্রাণী বলে ভুল করতো। ১৮৩৩-এ যখন তার মৃত্যু হয়, তখন ময়না তদন্তে প্রমাণিত হয় যে তার মস্তিষ্কের বিকাশ স্বাভাবিক ছিল না। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, সুস্থ সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুনই হাউসারের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি।

অমলা-কমলার কাহিনী ঃ

১৯২০ সালে ভারতে একটি নেকড়ের গুহায়, আট বছর ও দুবছরেরও কম বয়সী দুটি শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর কয়েকমাসের মধ্যে ছোটো অমলার মৃত্যু হলেও বড় মেয়েটি, কমলা, আরও নয় বছর জীবিত ছিল। কমলাকে যখন প্রথম খুঁজে পাওয়া যায় তখন সে পশুর মত হাত ও পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতো, কথা বলতে পারতো না; পরিবর্তে নেকড়ে সুলভ আওয়াজ করতো। বন্য জন্তুর মত মানুষ দেখলে ভয় পেতো। ক্রমে সে কিছুটা সামাজিক হয়ে ওঠে, অল্পস্বল্প কথা বলতে, পোষাক পরতে এবং মানুষের মত খেতে শেখে। অর্থাৎ অন্য মানুষের সংস্পর্শ তাকে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করে।

আন্নার ইতিবৃত্ত ঃ আন্না, একটি অবৈধ আমেরিকান কন্যাশিশুর সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৩৮-এ। ছয় মাস বয়স থেকেই তাকে নির্জন ঘরে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ে সে দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার পায় নি। অন্য কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসে নি। ফলে, পাঁচ বছর বয়সে যখন তাকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করা হয়, তখন তার মধ্যে সুস্থ, স্বাভাবিক শিশুর কোনো লক্ষণই বিকশিত হয় নি। ওই বয়সেও সে কথা বলতে বা হাঁটতে পারতো না, তার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশাতেও সে স্বচ্ছন্দ ছিল না। পরে অবশ্য কমলার মতো আন্নাও অন্যান্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে শুরু করে। উদ্ধারের পর মাত্র চার বছরই সে জীবিত থাকে, কিন্তু ১৯৪২-এ মৃত্যুর আগে সে অনেকটাই সামাজিক হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য উদাহরণগুলির মত আন্নার ঘটনাও প্রমাণ করে যে মানুষের মানবীয় প্রকৃতির উন্মেষ ও বিকাশ কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব।

সামাজিক গুণাবলীর বিকাশের অন্যতম তাৎপর্য হ'ল সমাজ উপযোগী বা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির নিজস্ব সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটে। শিশু অনুকরণ প্রিয়, জীবনের প্রারম্ভে সে অন্যান্যদের, বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণরীতিকে অনুসরণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে তার আচরণ অনুকরণ নির্ভর হলেও ক্রমে তার মধ্যে নিজস্বতা গড়ে ওঠে। অতি শৈশবে শিশু সর্বদা ব্যক্তি ও বস্তু, আত্ম ও পরের মধ্যে প্রভেদ করতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সামাজিক পরিবেশ ও সম্পর্কের প্রভাবে তার মধ্যে বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি, আত্ম-পরভেদ ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে। জর্জ হাবার্ট মীড্ সহ বেশ কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিক এবং সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক

শিশুর মনোজগতে কি ভাবে ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটে সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন। মীড মনে করেন যে, শিশু যখন খেলে তখন সে বাবা-মা বা অন্যান্য অভিভাবকদের ভূমিকা অনুকরণ করে। চার্লস এইচ্ কুলী সহ আরো কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে অন্যের ভূমিকা অনুকরণ থেকে ক্রমেই শিশুর মধ্যে আত্মসত্ত্বার বিকাশ হয়; সে শিখতে থাকে কিভাবে আত্ম ও পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। এই ভাবে, পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই শিশুর সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর খেলাধূলারও এক্ষেত্রে সর্বশেষ ভূমিকা বর্তমান। প্রথম প্রথম সে একা অন্যের অনুকরণের মাধ্যমে খেলে, ক্রমে সে অন্য সঙ্গীসাথীর সঙ্গে খেলতে শেখে। এইভাবে শিশুর মনে যৌথতা, সহযোগিতা, নিয়মের অনুসরণ, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদির ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে শিশু প্রতিনিয়ত অন্যের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে চেষ্টা করে, এই প্রচেষ্টা তার আত্মসত্তার বিকাশের সহায়ক।

এইভাবে প্রতিটি মানুষই তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে নিজের সত্ত্বাকে অর্জন করে। সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তির বংশগতিকে প্রভাবিত করে, আবার এর প্রভাব পড়ে ব্যক্তির মন ও চিন্তাশক্তির উপর। প্রতি মুহূর্তের সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানব-চৈতন্যে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে চলে, তার বিশ্বাস, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজ যেমন প্রভাব ফেলে তার ব্যক্তিত্ব তেমন রূপ ধারণ করে; সমাজ ব্যক্তিকে পূর্ণতা দেয়।

ব্যক্তি ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠীর সম্পর্ককে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিকই পূর্ণতা পায় সমাজে, আবার সমাজও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিকে নিয়েই। ব্যক্তি ও সমাজের এই পারস্পরিকতার প্রেক্ষিতেই তাদের সম্পর্ককে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

সংস্কৃতি ঃ উৎপত্তি, উদ্ভব ও উপকরণ — সংস্কৃতির ধারণা সমাজতত্ত্বসহ ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সবার আগে জানা প্রয়োজন সংস্কৃতি বলতে কি বোঝানো হয়। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কির মতে মানুষের বহু যুগের, বহু কীর্তি পুঞ্জীভূত হয়ে গড়ে তোলে তার সংস্কৃতি। এডোয়ার্ড টাইলার মনে করেন যে সংস্কৃতি হ'ল সমাজের সদস্যরূপে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পচেতনা তথা শিল্পকর্ম, নীতিবোধ, আইন, প্রথা, এবং সব ধরণের সামর্থ্য ও অভ্যাসের এক যৌগ। ওয়ালাস বলেন, সংস্কৃতি হল সমাজের ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, লক্ষ্য, ইত্যাদির সমন্বয়। এগুলি শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সম্প্রসারিত হয়।

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির সাহায্যে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সমাজবদ্ধ জীবন এবং সামাজিক আদানপ্রদানের সূত্রে মানুষ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, নীতি ও মূল্যবোধ, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত ও সম্প্রসারিত হয়ে চলে। তৃতীয়ত, সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট, এর দরুন একটি গোষ্ঠী বা সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকে। চতুর্থত, সমাজ ও সময়ভেদে সংস্কৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন জনসমাজের সংস্কৃতি যেমন পৃথক ও বৈচিত্র্যময়, একই সমাজের সংস্কৃতিও সময়, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে পরিবর্তিত হতে থাকে।

সংস্কৃতির উপকরণগুলিকে বস্তুগত বা 'মেটেরিয়াল' এবং অবস্তুগত বা 'নন-মেটেরিয়াল' এই দুটি ধরণে ভাগ করা যায়। বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের তৈরি যাবতীয় পার্থিব উপকরণ, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর, আসবাব, বাসনপত্র, পূজার সামগ্রী ইত্যাদি জীবনযাত্রার জন্য দরকারী যাবতীয় জিনিসপত্র। অপরদিকে অবস্তুগত সংস্কৃতি রূপে চিহ্নিত করা যায় ব্যক্তির ভাষা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গীসহ যাবতীয় ভাবগত বিষয়কে। ব্যক্তির জীবনে সংস্কৃতির দুই ধরণেরই অবদান অসামান্য; কারণ সংস্কৃতিই তাকে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার নানা উপায় শেখায়, ভাষা ও সংকেতের মাধ্যমে পরস্পর-সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখে মানুষ। ব্যক্তির জীবনচক্রের আচার অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নির্ধারণ করে সংস্কৃতি। এমনকি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পিছনেও সংস্কৃতির ভূমিকা যথেষ্ট। অর্থাৎ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয় সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির উদ্ভব — ব্যক্তি তথা সমাজের কাছে সংস্কৃতির ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর উদ্ভব কবে তা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। অ্যালভিন টফলারের মতে, বিগত পঞ্চাশ হাজার বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ৮০০ প্রজন্মের পথ অতিক্রম করে সংস্কৃতির বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ভাবগত ও বস্তুগত সংস্কৃতির উদ্ভব রূপান্তর ইত্যাদি সবই প্রায় এই সময়কালের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করে যে, প্রথম দিকে বস্তুগত সংস্কৃতির বিবর্তন ছিল অত্যন্ত শ্লথগতি, কিন্তু সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে ক্রমশ দ্রুততর। আধুনিক প্রযুক্তিগত যাবতীয় আবিষ্কার, প্রয়োগ এবং তাদের প্রভাবে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে বিগত দু'শো বছরে।

সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে মুখ্যতঃ দুই ভাবে, নতুন উপকরণ বা তা' ব্যবহারের পদ্ধতির আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রচলিত সংস্কৃতি থেকে নতুন উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে। অর্থাৎ উদ্ভাবন এবং সংমিশ্রণ এই দুটি প্রক্রিয়ার সূত্রে সংস্কৃতি বিকশিত এবং রূপান্তরিত হয়ে চলে। জর্জ মারডক এবং ক্রোয়েবারও মনে করেন যে সব সমাজেই সংস্কৃতির অন্তত ৯০ শতাংশ উপকরণ অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত এবং সংমিশ্রিত হয়ে নিজস্ব রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যেই ক্রমান্বয়ে এই সংমিশ্রণ, রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটে চলেছে সুদূর অতীত থেকে। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংযোগ যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এই প্রবণতা তত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সংস্কৃতির পরিবর্তন সমগ্র সমাজের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

সংস্কৃতির উপকরণ ঃ সংস্কৃতির উপকরণ নানাবিধ। এর মধ্যে রয়েছে বস্তুজগৎ সম্পর্কে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, বিশ্বাস, নীতি ও মূল্যবোধ, সংকেত তথা বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার, আচরণরীতি ইত্যাদি। সভ্যতার প্রথম পর্যায় থেকেই মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক জগৎকে জানতে, বুঝতে চেষ্টা করেছে। তার এই জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম ছড়িয়ে পড়েছে, নতুন প্রজন্মের অনুসন্ধিৎসা সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারকে

করেছে আরোও পুষ্ট এবং পরিণত। এর প্রভাব সমৃদ্ধ করেছে সংস্কৃতিকে আবার সংস্কৃতিও পূর্ণতা দিয়েছে সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে।

জ্ঞান কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতানির্ভর নয়, ব্যক্তি তথা সম্প্রদায়ের অন্ধবিশ্বাসও এর অঙ্গ। সংস্কৃতি ভেদে কোনো বিষয় সম্পর্কে যেমন ভিন্ন বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তেমন সংস্কার বা বিশ্বাসের পার্থক্য অনুযায়ী সংস্কৃতির রূপও হয় ভিন্ন। এর প্রভাবে গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা বা মূল্যবোধ। যে মূল্যবোধগুলি প্রবল, দীর্ঘস্থায়ী এবং সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত, যেগুলির অনুসরণ ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদা বা সম্মান দান করে সেগুলিকে বলা হয় মুখ্য বা প্রধান মূল্যবোধ, অন্যান্য মূল্যবোধগুলিকে গৌণ বলা হয়। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে মুখ্য ও গৌণ মূল্যবোধের প্রভাবে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার। যেমন ছবি, মূর্তি, পতাকা ইত্যাদি। ভাষা হ'ল একটি কথ্য চিহ্ন বা সংকেত। এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

কিংসলে ডেভিস মনে করেন যে, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন হয়। পুরনো, প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাবে স্বল্প হলেও পরিবর্তিত হয়; আবার একই সমাজের এক অংশের সংস্কৃতির পরিবর্তন অন্যান্য অংশের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে।

সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ ম্যাকাইভার ও পেজের মতে কোনো ব্যক্তির সমাজ ও জীবন সম্পর্কে যাবতীয় অভিজ্ঞতার ফসল হ'ল তার ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ, সমাজের সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব। কিম্বল ইয়ংয়ের মতে ব্যক্তির অভ্যাস, বিশ্বসংসার ও অন্যান্য মানুষদের সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা ইত্যাদি হ'ল ব্যক্তিত্বের উপকরণ। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে। সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ব্যক্তিত্বের গঠনে সাহায্য করে। স্থান, কাল ও পরিবেশ ভেদে সংস্কৃতি পৃথক হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। সমাজভেদে প্রথা ধর্ম, বিধি, সংস্কারের যে ভিন্নতা গড়ে ওঠে তার প্রভাবে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ধরণ গুরুত্ব পায়। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতাকে সমাজ চিরাচরিতভাবে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারা, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যক্তিত্বকে পরিণত করে। ফলে, কোনো সমাজেই সব মানুষের ব্যক্তিত্ব অবিকল এক হয় না। সমাজ, সম্প্রদায়, পরিবারের সমকালীন সংস্কৃতি, সামাজিক ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, ক্ষমতা-সম্পর্ক ইত্যাদির পাশাপাশি তার নিজ স্বাধীন চেতনা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষা ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাব ব্যক্তিত্বকে পরিণত এবং পরিবর্তিত করে। আধুনিক উদার সমাজের উদারপন্থী সংস্কৃতির প্রভাবে কাম্য ব্যক্তিত্বের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশে সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য; তবে, এই সম্পর্ক কখনই একমুখী নয়। উভয়ই উভয়কে প্রভাবিত করে। দৃঢ় এবং প্রবল ব্যক্তিত্বের

প্রভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি আলোড়িত ও প্রভাবিত হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের প্রভাব এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।

উপসংস্কৃতি বা সাব-কালচার : একটি জনসমাজের অভ্যন্তরে নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় থাকে, জনসমাজের সাধারণ সংস্কৃতির অধীনে আবার তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সেগুলিকে বলা হয় উপসংস্কৃতি। ডানকান মিচেলের মতে, 'উপসংস্কৃতি' অর্থে জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অংশের সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়। সমাজের সদস্যদের কাছে বৃহত্তর বা সামগ্রিক সংস্কৃতির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তার নিজ গোষ্ঠীর উপসংস্কৃতি। উপসংস্কৃতিগুলিকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন — মুখ্য আঞ্চলিক উপসংস্কৃতি, জনজাতি উপসংস্কৃতি, গ্রামীণ এবং নগরের উপসংস্কৃতি, শ্রেণীগত উপসংস্কৃতি, পেশাভিত্তিক উপসংস্কৃতি, ধর্মীয়-গোষ্ঠীর উপসংস্কৃতি ইত্যাদি। একটি উপসংস্কৃতির মধ্যেও আবার একাধিক উপসংস্কৃতি থাকে। সমাজ যত বৃহৎ ও জটিল হয়, উপসংস্কৃতির সংখ্যাও তত বিপুল হয়। প্রতিটি উপসংস্কৃতি ও তার শাখা-প্রশাখার মধ্যে প্রথা, লোকাচার, সৌজন্য বিধি, সাজপোশাক, বাক্যালাপরীতি, আচরণরীতি, অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি কিছুটা হ'লেও স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশ পায়। সমাজের সদস্যরূপে ব্যক্তি একই সাথে একাধিক পরিচয় বহন করে এবং সব ক'টি পরিচয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপসংস্কৃতিই তার উপর প্রভাব ফেলে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বা মুসলিম অধিবাসী একই সাথে অন্ততঃ চারটি উপসংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় — পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি উপসংস্কৃতি, তার গ্রামের স্থানীয় সংস্কৃতি, দারিদ্র্যের সংস্কৃতি এবং তার ধর্ম, বর্ণ, জাতের সংস্কৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে কোন উপসংস্কৃতির প্রভাব কতটা কার্যকর হবে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা : সংস্কৃতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে সভ্যতার ধারণা, যদিও সভ্যতা সংস্কৃতির তুলনায় অনেক জটিল ও বিবর্তিত পরিস্থিতি। সময়ের নিরিখে বিচার করলে মানবসমাজের শুরু থেকেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। অগ্‌বার্ন ও নিম্‌কফের মতে মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনার এক বিবর্তিত পর্যায় হ'ল সভ্যতা। ম্যাকাইভার ও পেজ মনে করেন মানুষের জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণ ও পদ্ধতিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে সভ্যতা। গোল্ডেনউইজারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবসমাজের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যা কিছু সৃষ্টি, যত প্রাপ্তি সবই 'সভ্যতা'র অন্তর্গত। বাহ্যিক, যান্ত্রিক, প্রয়োজন তৃপ্তকারী যাবতীয় উপকরণ ও তাদের প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে গড়ে ওঠে সভ্যতা।

সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনেক সময়ে সমার্থক মনে করা হ'লেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমত : সভ্যতার উপকরণগুলিকে ভাল-মন্দ, উন্নত-অনুন্নত ইত্যাদির মাপকাঠিতে পরিমাপ ও বিচার করা যায়। সংস্কৃতিকে কিন্তু এভাবে পরিমাপ করা যায় না। ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দের ভিত্তিতে সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা শুধু নিজস্ব অনুমান গড়ে তুলতে পারি।

দ্বিতীয়ত : সভ্যতা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলে, এই অগ্রগতিতে কোথাও কোনো ছেদ ঘটে না। প্রতিটি প্রজন্মের নতুন আবিষ্কার, নতুন ধ্যান-ধারণা সভ্যতার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে। সংস্কৃতির পরিবর্তন নিয়মিত ঘটলেও, তা অগ্রগতি কি না সেটি বলা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত : সভ্যতার অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাই সেগুলিকে জানা, বোঝা, সেগুলির সুফল ভোগ করা ইত্যাদিও সহজে সম্ভব হয়। কোনো সংস্কৃতির মূল্যায়ন ও উপলব্ধি কিন্তু এত সহজ নয়।

চতুর্থত : সভ্যতার উন্নতির ফসলগুলিকে বিভিন্ন সমাজ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় একে অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিজেরা কাজে লাগাতে পারে। বিশ্বের এক প্রান্তের উন্নত সভ্যতা অন্য প্রান্তের পিছিয়ে থাকা সভ্যতাকে সহজেই আলোকিত করে তোলে। সংস্কৃতির সম্প্রসারণ সব ক্ষেত্রে এত দ্রুত ও এত সহজে ঘটে না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথক হ'লেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরনির্ভর ও পরস্পর ক্রিয়াশীল। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই দুটির ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। জনসমাজের সর্ব অংশে এই পরিবর্তন সমান ভাবে ঘটে না। উন্নততর আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার সংস্পর্শে যে যে অংশ যত আগে আসে সেগুলির মধ্যে এক ধরণের সংস্কৃতি দেখা দেয়; আর তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া অংশে পুরনো প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। একই সময়কালে, একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এই সংস্কৃতিগত পার্থক্যকে অগবার্ন 'কালচারাল ল্যাগ' বা সাংস্কৃতিক ব্যবধান নামে চিহ্নিত করেছেন।

সভ্যতার উন্নতি নির্ভর করে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর; আবার সংস্কৃতিও সভ্যতার অগ্রগতিকে সম্প্রসারিত করে। সভ্যতার স্তরগুলি জনসমাজের বস্তুগত সংস্কৃতির নির্ণায়ক; অপরদিকে সংস্কৃতির ভাবগত উপাদানগুলিকে নিয়ে গড়ে ওঠে অ-বস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, একে অপরের পরিপূরক।

অনুশীলনী - ৬ + ১২ + ২০

একক-১ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(প্রতিটি ৬ নম্বর)

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণের চুক্তি মতবাদ।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাখ্যায় জৈব মতবাদ।

সংস্কৃতির বিকাশ।

উপসংস্কৃতি।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

সভ্যতার ধারণা।

খ) ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন :

(প্রতিটি ১২ নম্বরের)

কয়েকটি উদাহরণসহ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরণগুলির পরিচয় দাও।

সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

সভ্যতা কি? সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় কর।

গ) বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন :

(প্রতিটি ২০ নম্বরের)

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে বিভিন্ন মতবাদের আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

ব্যক্তিত্বের বিকাশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদানের মূল্যায়ন কর।

সংস্কৃতির উৎপত্তি ও তার উপকরণগুলির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

একক 2 ❑ বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি, রীতি এবং মূল্যবোধ, মতাদর্শ ও বিজ্ঞান

সামাজিক সম্পর্কের প্রধান দুটি স্তম্ভ হ'ল সদস্যদের পরস্পরের প্রতি আগ্রহ এবং মনোভাব। সমাজে বসবাস এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মনে নানারকম অনুভূতি গড়ে ওঠে। এগুলিকে বলা হয় অ্যাটিচ্যুড বা মনোভাব। যাকে বা যে বিষয়কে কেন্দ্র করে মনোভাব গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় আগ্রহ বা ইন্টারেস্ট। অর্থাৎ, রাগ, ভয়, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভালবাসা, শত্রুতা ইত্যাদি হ'ল মনোভাব; মনোভাবের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তি, গোষ্ঠীর ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিছু ধারণা গড়ে ওঠে। এই ধারণা যখন অতি দৃঢ় ও সবল হয় তখন তা' পরিণত হয় বিশ্বাসে। সমাজে কোনো গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মিলিত অবদান হ'ল ওই গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের বিশ্বাস। এর মধ্যে মিশে থাকে উপকথা, প্রবচন, কল্পকথা, লোকগাথা, কুসংস্কার, শিক্ষার্জিত জ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত ধ্যানধারণা যেগুলি সমাজের সদস্যদের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবৃত্তি ইত্যাদিকে প্রভাপিত করে। বিশ্বাস যে কেবল ব্যক্তির চিন্তন বা মনোজগৎকে প্রভাবিত করে তা নয়, এর দ্বারা ব্যক্তির আচরণও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

বিশ্বাসের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়টি। ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে বহু মানুষ বিশ্বাস করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। নানাবিধ গল্পকথা, অলৌকিক কাহিনী ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাস শুধু মাত্র এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সম্প্রসারিতই হয় না, ক্রমে তা আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। এই বিশ্বাসের সমর্থনে সমাজের সদস্যরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, উৎসব, উৎসর্গ ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের আরাধ্যের উপাসনা করেন। বিশ্বাস যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন ভক্তবৃন্দ জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অভিশাপের চিহ্ন খুঁজে পেতে থাকেন, এমনকি অভিশাপমুক্তির পথনির্দেশও তাঁরা বিশ্বাসের সূত্রে উপলব্ধি করেন।

বিশ্বাসের ধারণায় কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত : কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কোনো সামাজিক ঘটনা বা প্রসঙ্গকে যে ভাবে দেখে, অনুভব করে তারই ভিত্তিতে ওই বিষয়ে তাদের সমষ্টিগত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। সমষ্টির সদস্যদের অধিকাংশই সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত : এই বিশ্বাস কাঠামো দ্বারাই ওই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর এবং অলৌকিকের ধারণা গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত : প্রতিটি জনগোষ্ঠীতেই বিশ্বাস বেশ কিছু কল্পকথার জন্ম দেয়, সে কাহিনীগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কথিত হয় এবং ওই কল্পকথার সত্যতায় সকলের সংশয়হীন বিশ্বাস ক্রমে আরও দৃঢ় হতে থাকে।

চতুর্থত : বিশ্বাসের কেন্দ্রে থাকে দেব-দেবী বা তাঁদের নিষ্ঠাবান ভক্তের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী। কোন দেবতার গুরুত্ব কতখানি, সেটাও আমরা এই বিশ্বাসের মাধ্যমে বুঝতে পারি।

পঞ্চমত : বিশ্বাস কাঠামো গড়ে ওঠে পশু-পাখি, গাছপালা অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণকে কেন্দ্র করেও। যেমন ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, কথা বলা পশু, কামধেনু, কল্পতরু বট ইত্যাদি। এগুলিকে কেন্দ্র করে আমরা একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, সেগুলি কাল্পনিক হলেও কোনো জনগোষ্ঠী একে বাস্তব ভেবেই বিশ্বাস করতে পারে তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে। পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বাস সমাজ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তোলে তা সমাজের বিভিন্ন মহলে পরিব্যাপ্ত হয়ে, ওই ধারণাকে স্থায়ী জ্ঞানে পরিণত করে। পরবর্তীতে সেই সব ধারণা ও বিশ্বাস রাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা, জীবন দর্শন, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি সব কিছুকেই প্রভাবিত করতে থাকে।

সংক্ষেপে বলা চলে যে জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস কাঠামো হ'ল ওই গোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের অন্যতম চাবি-কাঠি। শুধুমাত্র দৈব বা অলৌকিকের ব্যাখ্যায় নয়, বিশ্বাসের প্রভাবে বহু আবিষ্কার, বহু সংস্কার আন্দোলন এবং বহু মতাদর্শের অনুসরণ সম্ভব হয়েছে। যেমন, মার্ক্সীয় মতাদর্শের মূলে আছে এই বিশ্বাস যে নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের জয় এবং শোষণকারী শ্রেণী তথা শোষক রাষ্ট্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বাসের একটি উপাদান হ'ল কুসংস্কার বা সুপারস্টিশন। প্রেজুডিস বা ভিত্তিহীন বিশ্বাসও বিশ্বাসের আর একটি দিক। জনসমাজে এই দুটির ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয় থাকলেও, এদের প্রভাব নেতিবাচক এবং সেহেতু সমাজের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। 'কুসংস্কারে'র অর্থ হ'ল এমন এক অন্ধবিশ্বাস যা মানুষকে অযৌক্তিক আচরণে উৎসাহ দেয়। এর প্রভাবে সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হ'ন। আদিবাসী সমাজে 'ডাইনি হত্যা' একটি অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার প্রভাবিত আচরণ।

কুসংস্কারের মতো 'প্রেজুডিস' বা ভিত্তিহীন বিশ্বাসও সমাজ জীবনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এর প্রভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক সময়ে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। কারণ, প্রেজুডিস কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মনে অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু অসত্য বা অর্ধসত্য ধারণাকে যাচাই না করেই বদ্ধমূল করে এবং বিপক্ষপাত মূলক আচরণকে প্রশ্রয় দেয়।

১৯২০-৩০-র দশকে প্রেজুডিসের ধারণা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সামাজিক মনস্তত্ত্বের আলোচনায়। সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে প্রেজুডিস এমন এক নেতিবাচক বিশ্বাস গড়ে তোলে যে মানুষের মন থেকে ন্যায়, যুক্তি, সহনশীলতা ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ মুগ্ধতা ও অন্য কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ প্রেজুডিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি : বিশ্বাস যেহেতু মনের গভীরে স্থায়ী প্রভাব ফেলে সেহেতু এর দ্বারা ব্যক্তির মনোবৃত্তি, পছন্দ-অপছন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিশেষত, প্রাচীন অথবা সনাতনপন্থী

সমাজে বিশ্বাসের প্রভাবে যে মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে তা' সাধারণত অনড় ধরনের হয়ে থাকে। তুলনায় আধুনিক এবং উদারপন্থী সমাজে মানুষ আধুনিক চেতনায় আস্থাশীল। জন্মপরবর্তী সময় থেকে সমাজের প্রভাবে, সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে পরিণত হয়। অতি শৈশবে তার সমগ্র অস্তিত্ব ও চেতনা থাকে আত্মকেন্দ্রিক বা নিজের জৈবিক প্রয়োজন ভিত্তিক। ক্রমে ক্রমে সে নিজ এবং অপর, ব্যক্তি এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অভ্যস্ত হয়; তবে অন্যান্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা সম্মান করলেও, তার জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন নিজের পরিবার ও পরিজনেরা, নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ জন। এই মনোভাব তার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে সমাজে সে কোন্ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পোষণ করবে এবং কোন গোষ্ঠীর সাথে দূরত্ব রক্ষা করবে। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ইত্যাদির আকর্ষণে সহযোগিতা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান ইত্যাদির সম্ভাবনা তীব্র হয়। অপরদিকে অবিশ্বাস, ঘৃণা ইত্যাদি মনোভাব শত্রুতায় ইন্ধন যোগায় সমাজতাত্ত্বিকেরা মনোবৃত্তির বিভিন্ন ধরণ বা প্রকারভেদ চিহ্নিত করেছেন। ম্যাকাইভার ও পেজ মনে করেন সমাজ-সদস্যদের মনোবৃত্তি তিন ধরণের-বিচ্ছেদাত্মক, নিয়ন্ত্রণাত্মক এবং মিলনাত্মক। অর্থাৎ, কিছু কিছু মনোবৃত্তি, যেমন — বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব এবং বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। আধিপত্য প্রবণতা, ক্ষমতাপরায়ণতা ইত্যাদি এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা বৃদ্ধি করে এবং বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন মানুষ, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও মিলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। মনোবৃত্তিগুলির প্রভাবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববোধ অথবা হীনম্মন্যতার ধারণা গড়ে ওঠে, ফলে নিজেদের এবং অপরের সম্পর্ককে তারা অনেক সময়ে কল্পিত শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার মানদণ্ডে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়।

সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই মনোবৃত্তিকে পরিমাপণযোগ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু এটি যেহেতু ব্যক্তির চেতনার অভ্যন্তরে থাকে যেহেতু তাকে পরিমাপ করা সহজ নয়।

রীতি ও মূল্যবোধ — সামাজিক রীতির ধারণাটি সমাজতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা, প্রথা, লোকাচার, আচরণরীতি, সামাজিক বিধি ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে, সেগুলি হল সামাজিক রীতি।

সামাজিক রীতির তাৎপর্য — সামাজিক রীতির সংক্ষিপ্ত ও সরল অর্থ হল সমাজের প্রচলিত ও অনুসৃত আচরণরীতি। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বলে এগুলি সমাজের সদস্যদের আচার-আচরণের অন্যতম নির্ধারক রূপে কাজ করে। রীতি বা নর্মের ধারণা দীর্ঘকাল ধরেই সমাজ চিন্তাবিদ্দের ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে; ইয়ং এবং ম্যাক মনে করেন রীতি সমাজের সদস্যদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্সফোর্ড ডিক্শনারী অফ্ সোসিওলজি রীতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, রীতি হ'ল সমাজের সাধারণভাবে স্বীকৃত সেই সমস্ত আচরণ যেগুলি আইনের মতই কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কি করণীয় সে

বিষয়ে নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ রীতির অন্যতম কাজ হ'ল সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সামাজিক শৃঙ্খলার সুরক্ষা। যে সমস্ত আচরণ বিধিবহির্ভূত বা বিধি অমান্যকারী সেগুলিকে বলা হয় 'বিচ্যুতিমূলক'। অধিকাংশ মানুষই সামাজিক বিধি বা রীতিগুলিকে মান্য করে চলতে সচেষ্ট হয় তাই, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রীতির ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ রয়েছে সমাজের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকার। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান স্থির করে দেয় তার ভূমিকাকে এবং প্রত্যেকের ভূমিকা অনুযায়ী সমাজে তার রীতিবদ্ধ আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়। অধিকাংশ ব্যক্তিই রীতি অনুযায়ী আচরণ করে কারণ তারা সমাজ-অনুমোদিত পথে আচরণ করাই কাম্য বলে মনে করে। রীতিসিদ্ধ আচরণ মাধ্যমে মানুষ নিজের এবং অন্যের কাছে নিজের বিশেষ পরিচয় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়।

সমাজের প্রচলিত রীতিগুলিকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের স্থির করা নীতি নিয়মগুলিকে তার ব্যক্তিগত রীতির পর্যায় ভুক্ত করা যেতে পারে। অপরদিকে সমাজ-নির্দিষ্ট রীতিগুলিকে সামাজিক রীতিরূপে চিহ্নিত করতে পারি। এগুলি ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করা হ'লে সমাজের চোখে তা অপরাধ বা বিচ্যুতি বলে পরিগণিত হয়; অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও সমাজে গ্রহণ করা হয়। সামাজিক রীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের উপর; এই মূল্যবোধগুলিই সামাজিক আচরণের রীতি-নীতিকে গড়ে তোলে। মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত ধারণা; বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামাজিক আচরণ এবং অনুসৃত রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে সেটি একটি স্পষ্ট আকার-ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সততা একটি মূল্যবোধ, সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে এই মূল্যবোধটি প্রকাশ পায়।

সামাজিক রীতির বৈশিষ্ট্য :— সামাজিক রীতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

প্রথমত : সামাজিক নীতি বিশ্বজনীন। আজ পর্যন্ত এমন কোনো সমাজই দেখা যায় নি যেখানে সদস্যদের জন্য কোনো রীতি বা আচরণ বিধি গড়ে ওঠেনি। আদিমতম সমাজে তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী রীতি বিধির উৎপত্তি হয়েছিল; আধুনিকতম সমাজেও বর্তমানের মূল্যবোধ অনুযায়ী সামাজিক রীতি প্রচলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সামাজিক রীতিগুলি গড়ে ওঠে বাস্তবের পরিবেশ পরিস্থিতির দাবি বা প্রয়োজন অনুযায়ী। অর্থাৎ, সামাজিক প্রয়োজন সামাজিক রীতির উৎস।

তৃতীয়ত : সামাজিক রীতি-নিয়মগুলি সমাজ অনুমোদিত আচরণের বিশেষ একটি আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরে। তবে সমাজের সমস্ত অংশের ন্যায় নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমান হয় না। বয়স, লিঙ্গ পরিচয়, জীবিকা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদে একই সময়ে, একই সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরণের মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। আধুনিক উদারনৈতিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে রীতি ও মূল্যবোধের এই পার্থক্য

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিপরীতে, আদিম এবং রক্ষণশীল সমাজে অধিকাংশের মধ্যে একই রকমের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠতো।

চতুর্থত : সামাজিক রীতিগুলিকে যতই কঠোর ভাবে কার্যকর করা হোক না কেন, কোনো সমাজেই সমস্ত সদস্য সর্বদা সমানভাবে এগুলিকে মান্য করে না। আইন বা রীতিভঙ্গকারীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও আদিম যুগ থেকে গড়ে উঠেছে। সমাজ বিশেষে ভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অপরাধ চেতনা এবং শাস্তির ব্যবস্থাও হয় ভিন্ন। শাস্তির ভয়, দৈহিক লাঞ্ছনা এবং সামাজিক অমর্যাদার আশংকা ব্যক্তিকে সমাজসিদ্ধ রীতি-অনুসারী হতে বাধ্য করে। রীতির অনুসরণের পিছনে শুধু শাস্তি বা 'তিরস্কারে'র ভূমিকাই প্রবল নয়, সমাজ নানাবিধ 'পুরস্কার' অর্থাৎ প্রশংসা, সমর্থন, স্বীকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির রীতি সিদ্ধ আচরণকে উৎসাহ দান করে।

পঞ্চমত : সামাজিক রীতি-নিয়ম ও সেগুলির সহযোগী মূল্যবোধগুলি নিয়মিত অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠে, ফলে সেগুলিকে মান্য করে চলতে সবাই অভ্যস্ত হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মূল্যবোধ ও রীতিগুলি সম্প্রসারিত হয়ে চলে। এই মূল্যবোধগুলিকে আত্মস্থ করে ব্যক্তি সহজেই কোন্ পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এইভাবে আশৈশব অভ্যাসের প্রভাবে সামাজিক রীতিগুলিকে সমাজের সদস্যরা মান্য করেন। অবশ্য নিয়মগুলির গুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা বিচার করেও সেগুলিকে মান্য করা হয়। রীতিগুলিকে অনুসরণ করার সূত্রে গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের একাত্মতার বোধও গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক রীতিগুলি কেবলমাত্র সমাজকে নিরাপদ রাখে না, সমাজ জীবনের সংহতি, গোষ্ঠীবন্ধন ইত্যাদিকেও রক্ষা করে।

দৈনন্দিনের আচার ব্যবহারে, জীবনচক্রের বিশেষ মুহূর্তগুলিতে ব্যক্তির প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপই নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক রীতি-নিয়মগুলির দ্বারা। ব্যক্তির সামাজিক আচরণ হয়ে ওঠে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও অনিশ্চয়তামুক্ত। ক্রমান্বয়ে অনুসরণের মাধ্যমে রীতিগুলি ব্যক্তির চেতনা, মনন ও ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠী অবস্থান করে। তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণেরই শুধু নয়, বিপরীতধর্মী মূল্যবোধের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। এই বহুত্ব গড়ে তোলে বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার সম্প্রসারণ। অন্যান্য জনসম্প্রদায়ের রীতি নিয়মগুলিকেও মানুষ তখন শ্রদ্ধা করতে শেখে।

রীতিহীনতা — রীতির অনুসরণ সর্বদাই সামাজিক জীবনে প্রশংসিত হয়, তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে কখনও কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। অনেক সময়েই সমাজে নানাবিধ কারণে, প্রচলিত রীতি তথা নৈতিকতার অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। এই অবক্ষয় অ্যানমি (anomie) বা রীতিহীনতা নামে পরিচিত। প্রখ্যাত ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ এমিল দ্যুর্খেম তাঁর 'সুইসাইড' গ্রন্থে সামাজিক পরিবেশে রীতিহীনতা ও আত্মহত্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে সমাজে এবং ব্যক্তির মধ্যে যখন রীতির অবক্ষয় তথা

রীতিহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে তখন সার্বিক সংহতির অভাব যেমন দেখা যায়, তেমন আবার ব্যক্তির মধ্যেও হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে সে আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে মার্টনও রীতিহীনতাকে নানা সমস্যার উৎস হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তির কাছে যদি রীতি-নিয়মের অর্থ, গুরুত্ব ইত্যাদি স্পষ্ট না হয়, যদি সমাজ অনুমোদিত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের যথাযথ পদ্ধতির মধ্যে অসংগতি গড়ে ওঠে তবে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই দুটি তত্ত্বেরই মূল কথা হল সমাজে জীবিকা এবং জীবনধারণের সমস্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সংহতির পরিমাণহ্রাস পেতে থাকে। পরম্পরা-বিচ্ছিন্ন মানুষের অস্তিত্বেও সংকট যত তীব্র হয়, রীতিহীনতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কখনও বা সে হতাশায় আত্মহত্যা করে; কখনও বা সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, রীতিহীন (বা অ্যানমিক) পরিস্থিতি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সমস্যার জন্মদাতা নয়, আত্মহনন-প্রবণতার বৃদ্ধি, অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক সমস্যারও উৎসস্থল।

সামাজিক মূল্যবোধ — সমাজতাত্ত্বিকদের বিচারে সামাজিক মূল্যবোধ একটি সমাজের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর ভিত্তিতে সমাজে শৃঙ্খলা, সংহতি, সহযোগিতা, সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতত্ত্বে সামাজিক মূল্যবোধকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এগুলির মাধ্যমে মূল্যবোধের এক একটি দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইয়ং এবং ম্যাকের মতে মূল্যবোধ হ'ল মুখ্যত কোনগুলি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধে অবচেতনের গড়ে ওঠা ধারণা। অনুরূপভাবে হরলম্বোস মনে করেন যে 'মূল্যবোধে'র ভিত্তিতে কি করা উচিত, কোন্ বিষয়টি অর্জনের চেষ্টা করা সে সম্পর্কে জনমানসে একটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে। পিটার ওর্সলির মতে, নিজেদের জীবনে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ যে কাম্য লক্ষ্যকে পেতে চেষ্টা করে, যা কিছু ভালো সে সবই মূল্যবোধের অন্তর্গত। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সাহায্যে ব্যক্তি যে আদর্শ বা ধারণাকে কাম্য বলে মনে করে, সেগুলিকে নিজের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়। কিছু কিছু আদর্শকে জীবনের সর্বস্তরে কাম্য বা শ্রেয় বলে মনে করা হলেও, সমাজের স্তরভেদে মূল্যবোধ পৃথক হ'তে পারে।

মূল্যবোধের কাজ — মূল্যবোধের প্রথম এবং প্রধান কাজ হ'ল গোষ্ঠীর বা সমাজের সদস্যদের জন্য লক্ষ্য বা আদর্শ স্থির করা। এছাড়া সমাজের সদস্যদের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা, সহযোগিতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা, সমাজের স্বীকৃত নিয়মগুলিকে সমর্থন ও বৈধতা দেওয়া; সমকালীন বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা ইত্যাদিও এর কাজ।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য — সাধারণভাবে মূল্যবোধগুলিকে দুটি বড় শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে — সাধারণ মূল্যবোধ এবং বিশেষ মূল্যবোধ। যে সমস্ত বিমূর্ত আদর্শগুলি সমাজ বা গোষ্ঠী জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত থাকে সেগুলিকে সাধারণ মূল্যবোধ বলা যেতে পারে। যেমন — সততা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ইত্যাদি। অপরদিকে জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব অর্জন করে সেগুলিকে বিশেষ মূল্যবোধ বলা চলে।

বহু স্তর গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় বিন্যস্ত সমাজে এক স্তর বা গোষ্ঠীর মূল্যবোধের সঙ্গে অন্যান্য স্তর, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তুলনায় সাদৃশ্যভিত্তিক সমাজে এই ধরণের বিরোধের সম্ভাবনা কম হয়।

কোনো সমাজেই সব মূল্যবোধ সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে মূল্যবোধগুলি ব্যক্তির জীবনে বিশেষ প্রাধান্য পায় এবং যেগুলি ব্যক্তির তথা গোষ্ঠীর আচরণ ও চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করে সেগুলিকে প্রাধান্যকারী মূল্যবোধ বলা হয়। এগুলি ব্যক্তির গোষ্ঠীর জীবনে স্থায়ী, গভীর এবং সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে; এগুলির অনুসরণের ফলে সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সততা বা দেশপ্রেমের মূল্যবোধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাধারণত মূল্যবোধগুলি সমাজে স্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। সরকারি বেসরকারি স্তরে, ব্যক্তিগত ভাবে, সব বয়সের মানুষের কাছেই এগুলিকে সমর্থন এবং প্রচার করা হয় যাতে সকলে ওই মূল্যবোধগুলিকে অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন। স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক ন্যায়ের মূল্যবোধ ইত্যাদিকে আমরা এই পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। আবার কিছু কিছু মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেগুলি সমাজজীবনে অন্তর্নিহিত ভাবে কাজ করে বলে— সেগুলিকে সম্মান করা হলেও সর্বদা সেগুলিকে উচ্চকিতভাবে প্রচার নাও করা যেতে পারে, যেমন— বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সম্মান করা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে কোনো একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সমজাতীয় মূল্যবোধ গড়ে উঠলেও পাশাপাশি বিকল্প বা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মূল্যবোধের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়েই এই ভিন্নমুখী মূল্যবোধগুলির মধ্যে সংঘাত ঘটে; সমাজের ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সাদৃশ্যভিত্তিক সমাজে মূল্যবোধের সমরূপতার জন্য এই ধরণের সংঘাতের সম্ভাবনা কম থাকে। অপরদিকে বহুত্ববাদী সমাজে বহুবিধ স্বতন্ত্র, বিচিত্র এবং সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মূল্যবোধের সহাবস্থান দেখা গেলেও, তাদের মধ্যে সংঘাতও লক্ষ্য করা যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সংঘাত মৃদু, মাঝারি বা তীব্র হয়ে থাকে।

মতাদর্শ ও বিজ্ঞান — মতাদর্শ বা 'ইডিওলজি'র ধারণা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক দেস্ট্যাট দ্য ট্রেসির লেখায়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মতাদর্শ' অর্থে এমন একটি সুবিন্যস্ত ধারণাকে বোঝানো হয় যার প্রভাবে সামাজিক রাজনৈতিক কর্মসূচিও গড়ে তোলা সম্ভব। অক্সফোর্ড ডিক্শনারী অফ সোসিওলজি অনুযায়ী এর মূল অর্থ হ'ল কোনো বিশেষ ধ্যান ধারণা বা কোনো বিশেষ চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এর সঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার এক বিশেষ যোগ রয়েছে। কারণ 'মতাদর্শ' কথাটিকে সাধারণত মার্ক্সবাদ অথবা মার্ক্সবাদ প্রভাবিত কোনো বিশ্লেষণী ধারার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব গড়ে তোলে; ভবিষ্যতের আদর্শ বা কাম্য সমাজ ব্যবস্থার রূপ নির্দেশ করে এবং ওই কাম্য সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায়টিকেও বিশ্লেষণ করে। 'মতাদর্শ' কিন্তু কোনো 'বদ্ধ' বা অনড় ধারণা নয়; কারণ সব মতাদর্শই নতুন, নতুন চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত, পরিবর্তিত ও পরিণত

হয়। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে মার্ক্সবাদ ছাড়াও উদারনীতিবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ (কন্‌জারভেটিজম্‌), নারীবাদ, পরিবেশবাদ ইত্যাদি মতাদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মতাদর্শের অন্যতম কাজ হ'ল রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক আচরণকে সংশ্লিষ্ট করা। অর্থাৎ এটি এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্ববীক্ষাকে লালন করে; আবার এর প্রভাবে নানা ধরণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, আন্দোলন ইত্যাদিও গড়ে ওঠে।

মার্ক্সবাদের প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মতাদর্শের ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ১৯৫০-র দশকে 'মতাদর্শের অবসানের' ধারণা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসীবাদের পতনে এবং পাশ্চাত্যের উন্নততর দেশগুলিতে সাম্যবাদের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ায় মতাদর্শের অবসানের ধারণা জোরালো হ'তে থাকে। এই ধারণার অন্যতম প্রবর্তক মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ড্যানিয়েল বেল মনে করেন যে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিছক নৈতিক ও তাত্ত্বিক ধ্যানধারণার যুগ শেষ হয়ে গেছে; এখন সময় এসেছে অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার। বেলের বক্তব্যকে ঘিরে তাত্ত্বিক মহলে এক জোরালো বিতর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৮০-র দশকে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ঘোষণা করেন যে সারা বিশ্ব জুড়ে একটি মাত্র মতাদর্শই বিরাজমান সেটি হ'ল উদার গণতন্ত্রের মতাদর্শ। এর কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যান্টনি গিডেন্স (১৯৯৪) মন্তব্য করেন যে সাম্প্রতিক বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রভাবে সব ধরণের মতাদর্শই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

মতাদর্শ ও বিজ্ঞান — মতাদর্শ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ককে বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞান বলতে কি বোঝানো হয় তা' জানা প্রয়োজন। 'বিজ্ঞান' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান হ'ল সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুসংবদ্ধ জ্ঞান।

বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এগুলি হ'ল, তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত, কার্যকারণ যোগ বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্তের সার্বজনীনতা, সত্যতা যাচাই, বস্তুনিষ্ঠতা, ভবিষ্যৎ প্রবণতা নির্ণয়, মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা ইত্যাদি। অর্থাৎ, গবেষকের কোনো কাল্পনিক বা মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে নয়, বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হয়। বাস্তব তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণকে বারবার যাচাই করে সত্যতা বা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সার্বজনীন, অর্থাৎ সব দেশ-কালে তা' সত্য, ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ; ফলে এটি হবে গবেষকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সহজ হলেও, সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেটি যথেষ্ট কঠিন, কারণ সমাজের সদস্যরূপে ব্যক্তি গবেষক সামাজিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূল্যবোধমুক্ত হয়ে উঠতে পারেন না, অনেক ক্ষেত্রে সেটিকে কাম্য বলে মনে করাও হয় না।

মতাদর্শ এবং বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটি যথেষ্ট জটিল। এর প্রধান কারণ হল উভয় প্রসঙ্গকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। সমাজতাত্ত্বিকেরা মতাদর্শকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিবাচক অর্থে মতাদর্শ বলতে বোঝায় মতামত, মূল্যবোধ এবং বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানব্যবস্থা। এই অর্থে, অতএব, মতাদর্শ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বর্তমান। নেতিবাচক অর্থে

কিন্তু মতাদর্শ ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী কারণ বিজ্ঞান সত্য জ্ঞান; অপরদিকে মতাদর্শ মিথ্যা বা বিকৃত জ্ঞান। মতাদর্শ কোনো ঘটনা বা বস্তুকে কেবলমাত্র তার বাহ্যিক দিক থেকে বিচার করে, বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। মুখ্যত মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদগণ মতাদর্শ ও বিজ্ঞানের মধ্যে এ জাতীয় বিভাজন লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ ভাবে এ দুটিকে বিরুদ্ধ ধারণা মনে না করে দুটিকে স্বতন্ত্র ধারণা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতাদর্শের ভূমিকা — বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান কোনো বিষয় ও পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠতা ও কার্যকারণ সহযোগে ব্যাখ্যা করে; বিপরীত ভাবে মতাদর্শ বিভিন্ন বিষয়কে বিশেষ মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কার্য কারণ সম্পর্ক, নির্দিষ্ট বিশ্বাস-ভিত্তিক যুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করে। ফলে মতাদর্শভিত্তিক ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপন্ন করা হলেও তা কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বা মূল্যবোধনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞানের মতো মতাদর্শও সমাজের আগমী পরিণতির সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে; কিন্তু সে ব্যাখ্যা হয় বিশেষ আদর্শের প্রতি পক্ষপাতমূলক।

সংক্ষেপে বলা যায়, মতাদর্শ এবং বিজ্ঞান নিজ নিজ পরিসরে একই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করলেও, দুটির দৃষ্টিভঙ্গী তথা অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন; সে জন্য দুইয়ের সিদ্ধান্তও ভিন্ন হয়।

অনুশীলনী

১। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ—** (৬ নম্বরের প্রশ্ন)

ক) বিশ্বাস বলতে কি বোঝ?

খ) বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলির পরিচয় দাও।

গ) মনোবৃত্তির ধারণাটির পরিচয় দাও।

ঘ) কুসংস্কার কি?

ঙ) 'প্রেজুডিসে'র তাৎপর্য নির্ণয় কর।

চ) সামাজিক রীতির অর্থ কি?

ছ) রীতিহীনতা বলতে কি বোঝায়?

জ) মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

ঝ) মতাদর্শ ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

ঞ) মতাদর্শ কি?

ট) বিজ্ঞানের অর্থ নির্ণয় কর।

২। **১২ নম্বরের প্রশ্ন :—**

ক) সমাজে বিশ্বাসের গুরুত্ব নির্ণয কর।

খ) কুসংস্কার ও প্রেজুডিসকে কেন নেতিবাচক বলা হয়েছে?

গ) সামাজিক রীতি-নিয়ম এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। ২০ নম্বরের প্রশ্ন :—

ক) সামাজিক রীতি ও মূল্যবোধের সংজ্ঞা নির্ণয় কর। কোনো সমাজে এ দুটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

খ) বিশ্বাসের অর্থ কি? সমাজে বিশ্বাসের কাজ ও গুরুত্ব নির্ণয় কর।

একক 3 ❑ সামাজিকীকরণ : প্রক্রিয়া এবং মাধ্যমসমূহ - পুনর্সামাজিকীকরণ- আত্মসত্ত্বার বিকাশের তত্ত্বসমূহ - সামাজিক কাঠামো

সামাজিকীকরণ : প্রক্রিয়া এবং মাধ্যম সমূহ : সামাজিকীকরণ হ'ল এমন এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা আশৈশব ব্যক্তিকে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, আচরণরীতি ইত্যাদি আত্মস্থ করতে ও সমাজোপযোগী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। জন্মের পর থেকে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার সূত্রে ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন আচার, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি আত্মস্থ করে সমাজজীবনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে; তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া : একটি সুদীর্ঘ, জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া রূপে এর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

প্রথমত : সামাজিকীকরণ এমন একটি ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজজীবনের উপযোগী হয়ে ওঠে। তবে জীবনের সব পর্যায়ে এর গতি বা মাত্রা সমান থাকে না।

দ্বিতীয়ত : জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, নতুন আচরণরীতি ইত্যাদি শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তার ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সে প্রতিটি বয়সের প্রতিটি ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে শেখে।

তৃতীয়ত : সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তথা আত্মসত্ত্বার বিকাশ ঘটে। অতি শৈশবে মানবশিশু 'আত্ম' বা 'অপর' সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। সামাজিকীকরণের প্রভাবে তার মধ্যে এই বিষয়ে বোধ জন্মায়। ভাল-মন্দ, ন্যায্য-অন্যায্য, প্রচলিত নিয়ম, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি শৈশব থেকে ব্যক্তি আত্মস্থ করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পরিবার, প্রতিবেশী সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সহ অন্যান্য মাধ্যমগুলি পুরষ্কার ও তিরস্কারের দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণে সাহায্য করেন; শিশুও ক্রমে কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ ভূমিকায় কি করণীয় এবং করণীয় নয় সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

সামাজীকীকরণের মাধ্যমসমূহ :— ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিকীকরণের বিভিন্ন 'এজেন্সী' বা মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাধ্যমগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধুগোষ্ঠী, প্রতিবেশী সমাজ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। কিংসলে ডেভিস এই মাধ্যমগুলিকে দুটি ধরণে ভাগ করেছেন; একটি ধরণে আছেন বয়োজেষ্ঠ্য, অভিভাবকস্থানীয় মানুষ যাঁরা শিশুর উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে তাকে প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শকে অনুসরণ করতে শেখান। অপর ধরণটিতে থাকে শিশুর সমবয়সী ও সমমর্যাদার মানুষ যারা সহমর্মিতার মাধ্যমে শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। এরা অনেক সময়ে অভিভাবকদের সম্পূর্ণ বিপরীত মূল্যবোধ, আদর্শ, জীবনচর্চার প্রতি সমর্থন গড়ে তোলে।

পরিবার : সামাজিকীকরণের মাধ্যম রূপে পরিবারের ভূমিকা শুরু হয় সবার আগে। শিশুর প্রথম জৈবিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে মায়ের সংস্পর্শে। আধুনিক ক্ষুদ্র পরিবারগুলিতে শিশুর সামাজিকীকরণে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। পরিবারেই প্রথম শিশু তিরস্কার-পুরস্কার ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়।

বন্ধুগোষ্ঠী — সমবয়সীদের নিয়ে গড়ে ওঠে বন্ধুগোষ্ঠী। বয়ঃসন্ধিতে পরিবার অপেক্ষাও বন্ধুগোষ্ঠীর প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধুগোষ্ঠীর প্রভাবে কিশোর-কিশোরীরা পরিবারের সামাজিকীকরণকে উপেক্ষা করতে বা তার বিরোধিতা করতে শেখে।

বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সামাজিকীকরণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন শিক্ষকগণ। নির্দিষ্ট পাঠক্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা, পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজে আদৃত হবার শিক্ষা দিয়ে থাকে। সনাতন ও ধ্রুব আদর্শগুলিকে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শুধুমাত্র বিদ্যালয় নয়, উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিকীকরণে সাহায্য করে।

প্রতিবেশী সমাজ — মানবশিশু নিজের পরিবারের বাইরে প্রথম পরিচিত হয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে, তার প্রথম বন্ধুবর্গ ও প্রতিবেশী সমাজের অন্তর্গত। অতএব, প্রতিবেশীদের প্রভাবেও সে বিভিন্ন মূল্যবোধ, আচরণরীতি, বাচনভঙ্গী, ভাষা ইত্যাদি অর্জন করতে শেখে।

গণমাধ্যম ইত্যাদি — সাম্প্রতিক বিশ্বে সব বয়সের মানুষের সামাজিকীকরণে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব ফেলে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম অর্থে সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, দূরদর্শন, অন্তর্জাল (ইন্টারনেট) ইত্যাদি বোঝায়। বিশ্বায়িত বিশ্বে গণমাধ্যমগুলির কল্যাণে অতি দ্রুত পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষ অন্যপ্রান্তের দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবৃত্তি, ভাষা, পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনদর্শন ইত্যাদি গ্রহণ করে খুব সহজেই আন্তর্জাতিক মানুষে পরিণত হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বহু অতীত থেকেই বই ব্যক্তির সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

কর্মস্থল — প্রাপ্তবয়স্ক, দায়িত্বশীল মানুষ তার কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ দ্বারাও প্রভাবিত হন। নতুন দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে শেখায় কর্মস্থল, সহকর্মীবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং কর্মী সংগঠনগুলি।

পুনর্সামাজিকীকরণ : সামাজিকীকরণের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজের উপযোগী মূল্যবোধ, আচরণরীতি ইত্যাদিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু মানুষকে এই পুরনো অভ্যাস ও মূল্যবোধগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন আচরণরীতি ও নতুন মূল্যবোধে প্রশিক্ষিত হতে হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পুনর্সামাজিকীকরণ, এর প্রভাবে অতীতের অভ্যাস ও মূল্যবোধের স্থান নেয় নতুন অভ্যাস, আচরণরীতি ও মূল্যবোধ। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত কারাগার, যুদ্ধ-বন্দীশিবির, সেনা-ব্যারাক, মানসিক রোগীদের আবাসস্থল, হস্টেল (ছাত্রাবাস) ইত্যাদিতে পুনর্সামাজিকীকরণ ঘটে।

আত্মসত্ত্বার বিকাশের তত্ত্ব সমূহ : সামাজিকীকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির আত্মসত্ত্বার (সেলফ্) যথাযথ বিকাশ সাধন। জন্মের সময়ে শিশুর কোনো আত্ম-চেতনা অথবা পারিপার্শ্বিক চেতনা থাকে না। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে তার নিজের সম্পর্কে এবং তার চারপাশের জগৎ, ব্যক্তি, বস্তু সম্পর্কে সে সচেতন হতে থাকে। এই 'আত্ম' সচেতনতাই তার সত্ত্বা চেতনার বিকাশ ঘটায়। এর মাধ্যমেই শিশুর মনে 'আত্ম' ও 'অপর' সম্পর্কে ধারণা তথা পার্থক্যের চেতনা গড়ে ওঠে। 'আত্মসত্ত্বা'র প্রকৃতি বিষয়ে যে ধারণাগুলির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল সি. এইচ্ কুলির 'লুকিংগ্লাস সেল্ফ' তত্ত্ব, জর্জ হার্বার্ট মীডের 'থিওরি অফ্ সেলফ্', সিগ্মন্ড ফ্রয়েডের 'মানবমনের তত্ত্ব' ইত্যাদি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নিজের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কি বা কেমন সেই চেতনাই তার আত্মসত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠা করে। কুলি এবং মীডের মত অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে ''সেল্ফ'' বা আত্মসত্ত্বার প্রকৃত অর্থ হল অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নিজেকে চিহ্নিত করা। আত্মসত্ত্বার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকার ধারণা; এই ধারণা সে অর্জন করে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। আত্মসত্ত্বার উন্মেষ ও বিকাশকে কেন্দ্র করে একাধিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে এবং এগুলি থেকে সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

চার্লস হর্টন কুলির 'লুকিং গ্লাস সেল্ফ' তত্ত্ব : — কুলির মতে সমাজ এবং আত্মসত্ত্বা একই মুদ্রার ভিন্ন মুখ। ব্যক্তি হিসাবে আমরা আমাদের ধ্যানধারণা, মনোবৃত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সব কিছুই অর্জন করি অন্যান্য সদস্যদের সূত্রে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তোলে তা' তার সত্ত্বা তথা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অন্যান্যদের ধারণার প্রতিফলন মাত্র। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মানুষ যেমন নিজেকে চেনে, তেমনি অন্যান্যদের অভিমতের সূত্রে সে নিজের ''আত্মসত্ত্বা'কে উপলব্ধি করে। আত্মসত্ত্বা চেতনার তিনটি মূল উপাদান বর্তমান। এগুলি হল — অন্যের দৃষ্টিতে আত্মসত্ত্বার রূপ কল্পনা; কল্পিত রূপ সম্পর্কে নিজের বিচার — বিবেচনার কল্পনা এবং নিজ আত্মসত্ত্বা বিষয়ে গর্বের অথবা সঙ্কোচের অনুভূতি। অর্থাৎ, অন্যের চোখে সে যেরকম, নিজেকেও সে সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়। 'লুকিং গ্লাস সেল্ফ' বা প্রতিবিম্বিত আত্মসত্ত্বার মাধ্যমে শিশু অন্যদের অভিব্যক্তি অনুসরণ করে সহজে অনুমান করে তার কোন আচরণ অনুমোদনযোগ্য এবং কোনটি নয়। অর্থাৎ, সে অন্যের দৃষ্টিতে নিজেকে বিচার করতে শেখে। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে কুলি বলেছেন যে, ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভাবে সে তেমন নয়, অন্যে তা'কে যেমন ভাবে সে তেমনও নয়, অন্যে তাকে যেমন ভাবছে বলে সে মনে করে, সে সেরকমই হয়ে ওঠে। আত্মসত্ত্বা সম্পর্কে ব্যক্তির এই অনুভব তার প্রাত্যহিক আচরণকে প্রভাবিত করে।

জর্জ হার্বার্ট মীডের 'আত্মসত্ত্বা'র তত্ত্ব :— কুলির মত মীড্ও মনে করেন ব্যক্তির আত্মসত্ত্বা' সমাজের অবদান; কারণ সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যক্তি তার প্রকৃত সত্ত্বা বা পরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলে এবং এই ভূমিকার মধ্যে দিয়েই সে নিজেকে জানতে, চিনতে, বুঝতে শেখে। মীড্ রোল প্লেইং বা ভূমিকা পালনের কথা বলেছেন। এর অর্থ, ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে অন্যের মনোভাব উপলব্ধি করার জন্য নিজেকে অন্যের জায়গায় স্থাপন করে; কল্পনায় অন্যের ভূমিকা পালন করে সে নিজের সম্বন্ধে অন্যের মনোভাব অনুমান করতে চায়। যেমন, শিশু

বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু বা অন্য যে কারোর ভূমিকায় খেলাচ্ছলে অভিনয় করে অন্যের দৃষ্টিতে নিজের গুরুত্বকে অনুভব করতে চেষ্টা করে। শিশু যাদের ভূমিকাকে অনুকরণ করে তাদের মীড্ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং সার্বিক সাধারণ ব্যক্তিবর্গ। জন্ম-পরবর্তী সময় থেকেই শিশু জৈবিক এবং মানসিক দিক থেকে একান্তভাবে মাতৃনির্ভর থাকে, ক্রমে ক্রমে বাবার উপরও তার এই নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এইকারণে মা-বাবা হলেন শিশুর কাছে সর্বাপেক্ষা 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ' ব্যক্তি। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বহির্জগতের সঙ্গে তার সংযোগ বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারের বাইরে অন্যান্য মানুষকেও সে অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে থাকে যেমন, খেলাচ্ছলে সে শিক্ষিকা, বন্ধু, সহপাঠী, স্কুলের আর্দালি, বাসের ড্রাইভার ইত্যাদি সকলের ভূমিকাই গ্রহণ করতে থাকে। এদেরকেই মীড্ বলেছেন 'জেনারালাইজড্ আদার' বা 'সার্বিক সাধারণ'। শুধু শৈশবেই নয়, পরিণত বয়সেও ব্যক্তির জীবনে এঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁদের অভিমত, মূল্যায়ন, নিন্দা-প্রশংসার মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

মীড্ 'আত্মসত্ত্বা' বিকাশের তিনটি কাল পর্বের কথা বলেছেন। প্রথম পর্বের সূত্রপাত হয় শিশুর বছর দুয়েক বয়সে, যখন তার মধ্যে কেবল অর্থহীন অনুকরণপ্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। এই সময় কালটিকে মীড প্রাক্ ক্রীড়া পর্ব নামে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বটি আরো একটু পরিণত শৈশবের সময়ে লক্ষ্য করা যায়। ওই সময়ে শিশু কিছুটা সচেতন ভাবে অপরের ভূমিকা অনুসরণ করে এবং খেলার সূত্রেই তার আত্মসত্ত্বার বিকাশ ঘটে।

তৃতীয় পর্বটিকে মীড্ চিহ্নিত করেছেন সংগঠিত ক্রীড়া পর্ব রূপে। একটি দলের খেলোয়াড়রা যেমন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পরবর্তী 'চাল' অনুমান করে নিজেদের ক্রীড়া ভূমিকা পালন করে; ঠিক তেমনই বৃহত্তর সমাজজীবনে পরিণত মানুষ অন্যান্য সমাজসদস্যদের ভূমিকা এবং সম্ভাব্য পদক্ষেপকে অনুমান করে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই ভাবে বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মসত্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে বলে মীড মনে করেন।

সিগমন্ড ফ্রয়েডের মানবমনের তত্ত্ব :— মনোবিশ্লেষণের প্রবর্তক সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর মানবমনের তত্ত্বের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ এবং আত্মসত্ত্বার বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী মানবমনের তিনটি স্বতন্ত্র স্তর বর্তমান। এগুলি হল ইড্ বা ব্যক্তির জান্তব প্রকৃতির তৃপ্তিসাধনের মাধ্যম, ইগো যা জান্তব প্রবৃত্তিকে দমন করে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং সুপার ইগো, যেটি সমাজোপযোগী আচরণের নির্ধারক। এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ জান্তব প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির দমন এবং সমাজ-স্বীকৃত মূল্যবোধ ও আদর্শের টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির 'সেলফ' বা আত্মসত্তা গড়ে ওঠে। ফ্রয়েডের বিশ্লেষণে 'সুপার ইগো' বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কারণ এর মধ্যে ব্যক্তির পারিবারিক মূল্যবোধের টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মসত্ত্বার বিকাশ এবং সামাজিকীকরণ উভয়ই সম্পন্ন হয়।

সামাজিক কাঠামো : সমাজতত্ত্বের অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক ধারণাগুলির অন্যতম হ'ল সামাজিক কাঠামোর প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'সমগ্র'কে কাঠামো বলা হয়, সমাজতত্ত্বে

কাঠামোর ধারণাকে প্রথম প্রয়োগ করেন হার্বার্ট স্পেন্সার। পরে দ্যুর্খেম, মারডক, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকরা কাঠামোর ধারণাকে ব্যবহার করেছেন। সমাজতত্ত্বে 'কাঠামো'র ধারণার সাহায্যে সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ কি ভাবে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করে, সমগ্র ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক সমাজতাত্ত্বিক আবার 'সামাজিক কাঠামো' কথাটির দ্বারা এক স্থায়ী, সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত সম্পর্ক বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝান।

সামাজিক কাঠামোর উপাদান : সামাজিক কাঠামোর বেশ কয়েকটি উপাদান বর্তমান। এগুলি হল বিভিন্ন উপগোষ্ঠী, সদস্যদের বিভিন্ন ভূমিকা, উপগোষ্ঠী ও ভূমিকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণের রীতি বা নিয়মাবলী, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। সংক্ষেপে উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাক।

১) **বিভিন্ন ধরণের উপগোষ্ঠী** — সমাজকে যদি একটি সুবৃহৎ গোষ্ঠীরূপে গণ্য করা হয়, তবে এর অভ্যন্তরের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি হল উপগোষ্ঠী। বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাকেন্দ্রিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে উপগোষ্ঠী বলা যেতে পারে। পরিবার, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, চার্চ, মঠ বা মিশন ইত্যাদির মত বহু উপগোষ্ঠী স্থায়ী এবং সদস্যদের তুলনায় অনেক দীর্ঘতর সময় ধরে টিঁকে থাকে। যেমন, ব্যক্তি সদস্যের মৃত্যু ঘটলেও, পরিবারের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

২) **গোষ্ঠীর ও সদস্যদের বহুবিধ ভূমিকা** — সামাজিক কাঠামো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর ভূমিকার জন্য। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা, তার অংশস্বরূপ উপগোষ্ঠীগুলি এবং এদের সদস্যরা পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলে, এই ভূমিকা পালনের অর্থ হল পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। ভূমিকাগুলি সচরাচর বহুমুখী, কারণ একই ব্যক্তিকে একই সময়ে, একই সামাজিক পরিসরে একাধিক ভূমিকা পালন করতে হয়, যেমন, পরিবারে ব্যক্তি স্ত্রীর স্বামী, সন্তানের পিতা আবার নিজেও পিতা-মাতার সন্তানের ভূমিকা একযোগে পালন করেন। পরিবারসহ সমস্ত উপগোষ্ঠী গুলিকেই সামাজিক রীতি নিয়ম ও প্রচলিত মূল্যবোধকে সম্মান করে নিজ ভূমিকা পালন করতে হয়।

৩) **উপগোষ্ঠী ও ভূমিকা নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক রীতি নিয়মসমূহ** — প্রতিটি সমাজেই উপগোষ্ঠীগুলি এবং তাদের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সামাজিক রীতি নিয়ম। এই রীতি নিয়মগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— ১) সম্পর্কভিত্তিক বা বাধ্যতামূলক এবং ২) অনুমোদন বা নিয়ন্ত্রণকারী। প্রথম ধরণের রীতি নিয়মের সাহায্যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্ ধরণের ভূমিকা পালন করতে হবে তা বোঝানো হয়। দ্বিতীয় ধরণের রীতি নিয়মের সাহায্যে উপগোষ্ঠীর সদস্যগণ কি কি করতে পারে কি কি করতে বাধ্য এবং কি কি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সে সব বিষয়ে নির্দেশ দান করে।

৪) **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ** — প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ থাকে এগুলির সাহায্যে সমাজের সদস্যরা কোনটি শ্রেয় এবং কাম্য আর কোনটি নয় তা সহজে নির্ধারণ করতে পারে।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অন্যতম কাজ হ'ল উপগোষ্ঠী তথা বৃহত্তর সমাজে সংঘাতের সম্ভাবনাকে হ্রাস করা।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানগুলির ভূমিকার জন্যই সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন সহ একাধিক সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক সামাজিক কাঠামোর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সামাজিক কাঠামোকে মানুষের বাস্তব সম্পর্কের জাল বিশেষ বলে মনে করেন। এই কাঠামোয় সমাজের সদস্যদের আচরণরীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার সূত্রেই আমরা ওই কাঠামোর অন্তর্গত সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই, সামাজিক কাঠামোকে অনুধাবন করলে সমাজের অন্তর্নিহিত রূপটিকে বোঝা সহজ হয়।

অনুশীলনী

১। **৬ নম্বরের প্রশ্ন : সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও** —

ক) সামাজিকীকরণের অর্থ কী?

খ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমরূপে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা কর।

গ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমরূপে বিদ্যালয় / বন্ধগোষ্ঠী / গণমাধ্যমের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

ঘ) পুনর্সামাজিকীকরণের তাৎপর্য কি?

ঙ) 'সেলফ' বা আত্মসত্ত্বা বলতে কি বোঝ?

চ) 'লুকিং গ্লাস সেল্ফ' তত্ত্বটি কি?

ছ) আত্মসত্ত্বা বিষয়ে জর্জ হার্বার্ট মীডের তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

জ) সামাজিক কাঠামো কি?

২। **১২ নম্বরের প্রশ্ন :**

ক) সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির ভূমিকা নির্ণয় কর।

খ) সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার তাৎপর্য নির্ধারণ কর। পুনর্সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পরিচয় দাও।

গ) 'সেল্‌ফ্' বা আত্মসত্ত্বার বিকাশের কুলির ও মীডের তত্ত্বের পরিচয় দাও।

ঘ) সামাজিক কাঠামোর উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। **২০ নম্বরের প্রশ্ন :**

ক) সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। এর মাধ্যমগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

খ) আত্মসত্ত্বার (সেল্‌ফ্‌) উদ্ভব ও বিকাশের তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা কর।

গ) সামাজিক কাঠামো বলতে কি বোঝ? সামাজিক কাঠামোর উপাদানগুলির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

একক 4 ❑ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রকৃতি, প্রকার এবং মাধ্যমসমূহ, আইনানুসরণ এবং বিচ্যুতি ঃ বিচ্যুতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ঃ সমাজের সদস্যরূপে প্রতিটি মানুষকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচরণরীতি, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি অনুসরণ করে চলতে হয়। অন্যথা সমাজ নানাভাবে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির উপর সমাজ-আরোপিত এই নিয়ন্ত্রণই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিত। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ই.এ.রসের মতে, ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সম্পন্ন হলেও অনেক সময়ে সে নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তখনই, সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য তাঁকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে। জনমত, আইন, ধর্ম, আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ইত্যাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত আচরণরীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে সেগুলি হোল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

প্রথমত ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজ-সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী, জনমত, ধর্ম, নৈতিকতা, মতাদর্শ, নেতৃত্ব ইত্যাদি সব কিছুই সমাজ-অনুমোদিত রূপ পরিগ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ এই ব্যবস্থা নানাবিধভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য ছোটো-বড় গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী ও ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তৃতীয়ত ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টির স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা।

চতুর্থত ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা অতি প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন যুগে এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষমাহীন, ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও অভিমতের কোনো স্থানই সেখানে ছিল না। কিন্তু আধুনিক সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি হয়েছে আগের তুলনায় অনেক লঘু ও নমনীয়।

প্রকারভেদ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকে প্রধানত দুই প্রধান ধরণে ভাগ করা যায় — আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা — এর দ্বারা রাষ্ট্র-প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণসমূহকে বোঝানো হয়। নাগরিকদের আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রে আইন প্রশাসন, পুলিশ, আদালত, জেল, সামরিকবাহিনী ইত্যাদি সক্রিয় থাকে, এবং বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, শাস্তিদান ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্র-অনুমোদিত রীতি-নিয়ম অনুসারে আচরণ করতে বাধ্য করে। এই সব নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থাকেই সংক্ষেপে আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ রূপে চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকর্তৃক সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয় এবং জনগণকে এর বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করে তোলা হয়।

অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা — সমাজের সদস্যদের আচরণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের অ-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা যেমন — প্রথা, রীতি-নীতি, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায় বিচারের ধারণা, ধর্ম ইত্যাদির পাশাপাশি পরচর্চা পরনিন্দা, অনুযোগ, সহানুভূতি ইত্যাদি লৌকিক ব্যবস্থাগুলিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলা হয়। সচেতন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে গড়ে তোলা নয়, এগুলি গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের অভ্যাসের মাধ্যমে। পরিবার, প্রতিবেশী সমাজ, গ্রামীণ সমাজ, আদিবাসী গোষ্ঠী জীবন — যেখানেই ব্যক্তিগত, অনানুষ্ঠানিক, মুখোমুখি সম্পর্ক, সেখানেই এ ধরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হয়। সময়ের সাথে সাথে আধুনিক সমাজে একদিকে যেমন চিরাচরিত অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে, অপরদিকে ইন্টারনেটের দুনিয়াকে কেন্দ্র করে ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদি নতুন ধরণের অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম — কোনো সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি কতটা সরল বা জটিল হবে তার উপরই নির্ভর করে সেখানকার নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থা। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক এই নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমগুলির প্রকৃতি ও ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমরূপে আইন — আইন হল রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বৈধ নিয়ম। ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মাধ্যম হ'ল বিধিবদ্ধ আইন। এর সাহায্যে অপরাধ-নিবারণ, নাগরিকদের যাবতীয় অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষা, রাষ্ট্রে তথা সমাজে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি আইনের পিছনেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সচেতন ভাবনা, পরিকল্পনা ও জনকল্যাণের প্রয়াস বর্তমান থাকে। আইন লঙ্ঘনের অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্রের ইচ্ছা লঙ্ঘন; অতএব, আদালতের মাধ্যমে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আইনের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই সেগুলিকে লিখিতভাবে নথিবদ্ধ করে সুস্পষ্ট রূপে দেওয়া হয় এবং আইনের নির্দেশ বাধ্যতামূলক ভাবে কার্যকর হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয় আইন গড়ে ওঠে প্রথা, ধর্ম, ন্যায়বিচার, আদালতের রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রাচীন সমাজে প্রথার পাশাপাশি ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুশাসনও আইনের উৎসরূপে পরিচিত ছিল। আইন মান্য করার অন্যতম কারণ হ'ল ভীতি অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘিত হ'লে ঈশ্বর রুষ্ট হবেন সেই ভয় এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত শাস্তির ভয়। আইন মান্য করার অন্যান্য কারণ হ'ল আইনের উদ্দেশ্য, বক্তব্য এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং আইনের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় বিশ্বাস। আইনের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলে, আদালত, কারাগার এমনকি সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগানো হয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা — শিক্ষা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে শিশু থেকে সমস্ত বয়সের মানুষের চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপকে প্রভাবিত করা যায়, তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে মানব শিশু বিদ্যাশিক্ষা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পুরস্কার-তিরস্কার ব্যবস্থা ইত্যাদির সূত্রে আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পরিচিত হয়। শিক্ষার পদ্ধতি, প্রকরণ, পাঠ্যবিষয় ইত্যাদির

পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যক্তিকে সামাজিক মূল্য, নৈতিকতা, মানবিক আদর্শ, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সুস্থ প্রতিযোগিতা, আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে শেখায়। প্রয়োজনে ব্যক্তিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতেও শেখায় শিক্ষা ব্যবস্থা। এর থেকেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে নতুন মূল্যবোধ, নতুন সামাজিক আদর্শ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নতুন ধ্যান-ধারণা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে জনমত — কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে জনগণের অধিকাংশের অভিমতকে জনমত বলা হয়। সব সমাজেই এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী মাধ্যম। প্রাচীন সমাজে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি; সুতরাং ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা ছিল প্রবল। জনমতের নেতিবাচক প্রভাব ব্যক্তির মনে লোক-লজ্জা, নিন্দিত, কলঙ্কিত হবার আশংকা, সমালোচনা, ভয় ইত্যাদি গড়ে তোলে, এই সবের ভয়ই ব্যক্তির আচরণ, মতামত প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। বর্তমানে জনমতগঠনের প্রধান উপায়গুলি হ'ল মুদ্রণমাধ্যম, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ইন্টারনেট, আইনসভা, সুশীল সমাজ (সিভিল সোসাইটি) ইত্যাদি। এই মাধ্যমগুলি সংবাদ পরিবেশন, বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অভিমতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বিতর্ক ইত্যাদির সাহায্যে জনমত গঠন করে এবং সামাজিক মূল্যবোধের নতুন মানও সৃষ্টি করে। এর প্রভাব এসে পড়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর। গণমাধ্যম ও জনমত পুরনো, চিরাচরিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যেমন কার্যকর ও দৃঢ় করে, প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও অপসারণেও সাহায্য করে।

প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ — সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি সার্থক মাধ্যম হ'ল প্রচার ব্যবস্থা। সব সমাজেই সরকারি ও বেসরকারি প্রচারযন্ত্র জনমত, মতাদর্শ, আচরণরীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে ক্ষমতাসীন শক্তির ইচ্ছানুযায়ী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজ হয়। প্রতিটি দেশেই সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এই সচেতনতা পরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ — সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল বলপ্রয়োগ। এর দরুন নিতান্ত অনিচ্ছুককেও নিয়ন্ত্রণের অধীন হতে হয়। আধুনিক সমাজে কেবলমাত্র রাষ্ট্রশক্তিই পুলিশ, জেলখানা ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বলপ্রয়োগের বৈধ অধিকারী। সমাজে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনকে বিশেষ ক্ষেত্রে স্বীকার করেও বলা চলে যে এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকৃত কার্যকরী করে তুলতে পারে না; বরং এর মাত্রাছাড়া প্রয়োগ জনজীবনকে বিপর্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণবিরোধী করে তোলে। অতএব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এই মাধ্যমটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সামাজিক প্রথা, লোকাচার, রীতি-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ — মানুষের একান্ত পরিসরের আচরণরীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা প্রথা, রীতি-নীতি ও লোকাচার। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচলিত ও অনুসৃত এই ব্যবস্থাগুলিকে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মান্য করে চলে। এগুলিকে অগ্রাহ্য করা যেমন সহজ হয় না; তেমন এগুলিকে লঙ্ঘন করলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াও হয় অতি তীব্র।

ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ — অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ধর্ম সামাজিক নিযন্ত্রণের এক শক্তিশালী মাধ্যম। ধর্ম এবং ধর্মীয় নির্দেশ সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধগুলিকে দৃঢ় করে। প্রাচীন সভ্যতা থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় নিয়ম, দৈব নির্দেশ, পাপ-পুণ্যের ধারণা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মগুরুদের জারি করা আদেশ বা ফতোয়া ইত্যাদি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসেছে। আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তি স্বাধীনতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় অবশ্য ধর্মের ভূমিকা পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হয়েছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নৈতিকতার ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সততা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, দয়া-মায়া, ত্যাগ, অধ্যবসায়, ভদ্রতা ইত্যাদি মূল্যবোধ চিরকালই সমাজে গুরুত্ব পেয়েছে। আজও এগুলির মাপকাঠিতে ব্যক্তির আচরণের ভালত্ব-মন্দত্বকে সমাজ বিচার করে। এই নৈতিক আদর্শগুলি ব্যক্তির আচরণকে তার অভ্যন্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত রেখে সমাজের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অনেক সময়েই ধর্মীয় চেতনা নৈতিকতার মানকে নির্ধারণ করে।

অন্যান্য মাধ্যম — ফ্যাশান, সৌজন্য বিধি ইত্যাদিও ব্যক্তির আচরণকে অনানুষ্ঠানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজজীবনে অংশগ্রহণের মানকে নির্দেশ করে এগুলি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখে। এগুলিকে লঙ্ঘন করলে ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয় না ঠিকই কিন্তু পরিচিত মহলে নিন্দা, সমালোচনা, প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা অনেক বেশি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

নিয়মানুসরণ (কন্‌ফর্মিটি) — সংঘবদ্ধ জীবনের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বেশ কিছু রীতি-নিয়ম গড়ে ওঠে। এই রীতি ও নিয়মগুলিকে মান্য করে চলাকেই বলা হয় নিয়মানুসরণ। সমাজ নৈতিকতার প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠির ভিত্তিতে সদস্যদের জন্য বেশ কিছু লক্ষ্য, আদর্শ এবং এই লক্ষ্য-পূরণের বিভিন্ন পথকে চিহ্নিত করে দেয়। অধিকাংশ মানুষই সেগুলিকে মান্য করে চললেও, কখনো কখনো তার ব্যতিক্রম দেখা দেয়; লক্ষ্য অথবা লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় অথবা উভয়কেই কেউ কেউ অগ্রাহ্য করেন। একে বলা হয় 'বিচ্যুতি'।

নিয়মানুসরণের বেশ কিছু কারণ বর্তমান। এগুলি হ'ল সামাজিকীকরণের প্রভাব, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার গড়ন, সামাজিক রীতি-নিয়মের গুরুত্ব অনুধাবন, কার্যকরী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মতাদর্শ, অভ্যাস ইত্যাদি। এইগুলির সম্মিলিত প্রভাবে ব্যক্তি সমাজজীবনের রীতি-নিয়ম, লক্ষ্য আদর্শ ইত্যাদিগুলিকে মান্য এবং অনুসরণ করে। সামাজিক নিয়মের অনুসরণে ব্যক্তির নিজস্ব চেতনার প্রভাব যেমন কার্যকর, তেমনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভূমিকাও যথেষ্ট কার্যকর থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হ'ল শাস্তিদানের মাধ্যমে অথবা শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়মানুসারী করে তোলা।

নিয়মানুসরণ এবং বিচ্যুতি — গোষ্ঠীজীবনের রীতি নিয়মের বিরুদ্ধাচরণই হল বিচ্যুতি। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেমন সচরাচর সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসরণ করে সমাজকে সুশৃঙ্খল এবং নিয়ন্ত্রিত রাখে। অনেক সময়ে আবার প্রচলিত রীতি-নিয়ম, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে উপেক্ষাও করে। সেই আবরণকে বলা হয় 'বিচ্যুতি'। সমাজের কিছু মানুষের আচরণে নিয়মিত বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়; আবার নিয়ম অনুসরণকারীদের মধ্যেও কখনো বিচ্যুতি দেখা যায়। সামাজিক নিয়মাবলীর উপেক্ষা, আইনলঙ্ঘন, অবৈধ আচরণ, অপরাধ ইত্যাদি সবই বিচ্যুতির পর্যায়ভুক্ত।

বিচ্যুতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন ধরণে ভাগ করা হয়। এগুলি হল উদ্ভাবন বা প্রচলিত মূল্যবোধকে স্বীকার করে নিয়মের অনুসরণ; সমাজ-অনুমোদিত লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপূরণের উপায় উভয়কেই অস্বীকার তথা বিচ্ছিন্নতা এবং বিদ্রোহ।

বিচ্যুতির কারণ — বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণ বর্তমান। যেমন, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগে ব্যর্থতা, ভুল যুক্তির সাহায্যে বিচ্যুতিকে সমর্থন, আইনরক্ষকদের দুর্নীতিপরায়ণতা, অপরাধ উপসংস্কৃতির উপস্থিতি, অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য, সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির অস্পষ্টতা ইত্যাদি। বিচ্যুতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের ক্ষতি করে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করে, ব্যক্তি সামাজিক কর্তব্যের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে এবং সমাজ সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সম্মানের অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিচ্যুতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সামাজিক বিচ্যুতি তথা অপরাধের মূলত তিন ধরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে, যেমন — জীববৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা সেই তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র অপরাধ কি বা কেন সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজে নি, কারা অপরাধী এবং কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তারও ইঙ্গিত দিয়ে অর্থাৎ অপরাধ এবং অপরাধীর প্রকৃতিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তত্ত্বগুলি বিভিন্ন সময়ে সমাজ-নিয়ন্ত্রণের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করেছে। অতএব, এই তত্ত্বগুলিকে জানা বিশেষ জরুরী। যদিও তত্ত্বগুলি বিভিন্ন সময়ে সমাদৃত হয়েছে এগুলির কোনোটিই কিন্তু সমাজকে সম্পূর্ণভাবে অপরাধমুক্ত রাখার সঠিক পথের সন্ধান দিতে বা অপরাধের কারণগুলিকে নিশ্ছিদ্রভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। সেই কারণেই সমাজের নীতি নির্ধারকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে অপরাধ ও অপরাধী দমনের পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন।

বিচ্যুতি ও অপরাধের বায়োলজিক্যাল বা জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা — অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই ব্যাখ্যাটির আশ্রয় নিয়েছেন মুখ্যত তিনজন ইটালিয় চিন্তাবিদ — সেসারে লম্ব্রোসো, এন্‌রিকো ফেরি এবং গ্যারোফ্যালো। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক এবং অধ্যাপক লম্ব্রোসোর অন্যতম পরিচয় হল তিনি 'অপরাধ বিজ্ঞানের জনক'। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অপরাধের বিশ্লেষণে তিনি প্রথম জৈবতত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, কিছু মানুষ জন্মসূত্রেই অপরাধী; জন্ম থেকেই এদের দেহে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বা অস্বাভাবিকত্ব থাকে যা থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে তারা অপরাধী বা সম্ভাব্য অপরাধী। যেমন, মুখের গড়ন সামঞ্জস্যহীন, বড় বড় কান, হাতগুলি অতিরিক্ত লম্বা, বাঁকা নাক, ঢালু কপাল, কর্কশ চুল, অস্বাভাবিক গড়নের চোখ, ব্যথা-বেদনার অনুভূতিহীন ইত্যাদি। লম্ব্রোসো মনে করেন, এদের চেহারার মধ্যে এক ধরণের আদিম বন্যতা থাকে। এই আদিমতা এবং আধুনিক সভ্যতার থেকে পিছনে হাঁটা — এই দুই কারণেই ব্যক্তি অপরাধ করে বা করতে বাধ্য হয়। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে কিছু কিছু ব্যাধির কারণে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও শারীরিক কিছু খাম্‌তি দেখা দিতে পারে এবং এর অভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উগ্রতা, হত্যা-প্রবণতা ইতাদি প্রকট হয়ে ওঠার

সম্ভাবনা থাকে। সেনাবাহিনীর প্রায় তিন হাজার সৈনিকের দেহের গড়ন বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন 'অন্ ক্রিমিন্যাল ম্যান' (১৮৭৬) গ্রন্থে। তিনি মনে করেন, যেহেতু নিরপরাধ এবং অপরাধ প্রবণদের দৈহিক গঠন খুব স্পষ্টতই স্বতন্ত্র, সেহেতু শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখেই বলা যায় কে অপরাধী এবং কে অপরাধী নয়।

লম্ব্রোসো অপরাধীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন : জন্ম-অপরাধী, যারা জন্মসূত্রেই আদিমতার লক্ষণ বিশিষ্ট অপরাধী; উন্মাদ, বাতিকগ্রস্ত, বুদ্ধিহীন বা অপরিণত মস্তিষ্ক, মৃগীরোগগ্রস্ত এবং পানাসক্ত অপরাধী; অনিয়মিত বা সুযোগ নির্ভর অপরাধী এবং আবেগপ্রবণ অপরাধী। শেষোক্তরা ক্রোধ, প্রেম বা সম্মানরক্ষার তাগিদে অপরাধ ঘটায়। লম্ব্রোসো অবশ্য বারে বারেই নিজের সিদ্ধান্তকে নতুন করে সাজিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে দৈহিক লক্ষণ ছাড়াও ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, বৈবাহিক প্রথা, আইন, সরকারি কাঠামো, চার্চের ভূমিকা ইত্যাদিকেও অপরাধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লম্ব্রোসো জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অপরাধীদের কথা বললেও 'বর্ণ ক্রিমিন্যাল' বা জন্মগত অপরাধী কথাটি কিন্তু তিনি ব্যবহার করেন নি। ওই অভীধাটির স্রষ্টা হলেন এনরিকো ফেরি। অপরাধ বিষযে লম্ব্রোসোর জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক সময়ে অতি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, বর্তমানে কিন্তু সেটি অতি সরলীকৃত বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে তাঁর তত্ত্বে অপরাধের জৈব লক্ষণের পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষণও স্থান পেয়েছে।

লম্ব্রোসোর পরে যিনি জীববৈজ্ঞানিক মতটিকে আরও দৃঢ় করেন তিনি হলেন এনরিকো ফেরি (১৮৫৬-১৯২৯)। লম্ব্রোসোর মত তিনিও মনে করেছেন, কিছু মানুষ জন্মসূত্রেই অপরাধপ্রবণ হয়; একে তিনি বলেছেন 'বর্ন ক্রিমিন্যাল'। অপরাধী নির্ণয়ের এই বিশেষ পরিচয় তাঁরই উদ্ভাবন। জন্মগত অপরাধীদের পাশাপাশি ফেরি আরও বিভিন্ন ধরণের অপরাধীদের কথা বলেছেন, যেমন, উন্মাদ বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অপরাধী, প্যাশন বা আকোতাড়িত অপরাধী, অনিয়মিত অপরাধী অথবা যারা বিশেষ সামাজিক ও পারিবারিক কারণে অপরাধ ঘটিয়ে ফেলে, এবং নিয়মিত অপরাধী বা যারা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত ইত্যাদি। উনি অবশ্য অনিচ্ছাকৃত অপরাধীদের কথাও বলেছেন। অপরাধ হ্রাস করার জন্য ফেরি জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বল্পমূল্যের আবাসন ব্যবস্থা, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন।

রাফায়েল গ্যারোফ্যালো (১৮৫২-১৯৩৪) তাঁর 'ক্রিমিনোলজি' (১৮৮৫) গ্রন্থে সমাজজীবনে 'শ্রেষ্ঠের উদ্‌বর্তনের নীতি'র উপর ভিত্তি করে অপরাধীর ব্যাখ্যা করেছেন। ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে এই 'Survival of the fittest' নীতিটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গ্যারোফ্যালো মন করেন, সমাজ হল একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক (natural) দেহস্বরূপ; এটি প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তির কর্তব্য এই প্রাকৃতিক আইনকে মান্য করে চলা। অপরাধীর অর্থ প্রাকৃতিক আইনের বিরোধিতা করা। প্রকৃতির আইনগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে যুক্তিবোধের উপর; অতএব, অপরাধ হল অযৌক্তিক আচরণ। অপরাধীদের দৈহিক বিকৃতি থাকুক বা না থাকুক, সভ্যসমাজে ব্যক্তির চেতনায় যে ন্যায়বোধ, সহমর্মিতা সুপরিণত থাকে, অপরাধীদের মধ্যে সেগুলি লক্ষ্য

করা যায় না। এই বিশ্বাসে নির্ভর করে তিনি অপরাধীদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন, খুনিদের মধ্যে মমতার অনুভূতি এবং সম্পত্তির অধিকার — এই দুই সম্বন্ধেই ধারণা থাকে অত্যন্ত স্পষ্ট। সেজন্যই তারা বিনা দ্বিধায় চুরি, হত্যার মত অপরাধ ঘটায়। হিংসাত্মক অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তাদের মধ্যে মমতার বোধ গড়ে ওঠে না। আর চোরদের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার চেতনা থাকে অনুপস্থিত। যৌন অপরাধীদের মধ্যে যারা সহিংস তাদের ন্যায়-নীতির বোধ থাকে দুর্বল; এবং অন্যদের মধ্যে মমত্বের অভাব থাকে। গ্যারোফ্যালো আরও মনে করেন যে প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে যেহেতু স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের অভাব থাকে সেহেতু সমাজে তাদের স্থান দেওয়া উচিত নয়, মৃত্যদণ্ডই তাদের একমাত্র শাস্তি। অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি হিসাবে তিনি কারাদণ্ড বা নির্বাসনের কথা বলেছেন। গ্যারোফ্যালোর দৃষ্টিতে ব্যক্তি হল সমাজ-দেহের একটি কোষ মাত্র; একটি কোষ বিনষ্ট হলে যেমন জীবদেহের কোনো ক্ষতি হয় না, দুষ্ট কোষস্বরূপ অপরাধীদের সমাজ দেহ থেকে অপসারণ করলেও তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।

অপরাধীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করার প্রবণতাটি বহুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৩৯-এ মার্কিন নৃবিজ্ঞানী আর্নেস্ট এ হুটন (Hooton) ঘোষণা করেন যে সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় অপরাধীরা শারীরিক বিচারে সবদিক থেকে নিকৃষ্ট। হুটনের তত্ত্ব নানা কারণে বর্ণবিদ্বেষী রূপে প্রবল সমালোচিত হলেও প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের 'বডিটাইপ' বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজটা চলতে থাকে ১৯৫৯-র দশক পর্যন্ত। রিচার্ড ডুগ্‌ডেল নানাবিধ তথ্যের সাহায্যে অপরাধপ্রবণ ডিউক পরিবার এবং শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এডওয়ার্ড পরিবারের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে জীনগত কাঠামোর পার্থক্যে কোনো পরিবারে অপরাধপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং কোনো কোনো পরিবারে লক্ষ্য করা যায় না। উইলিয়াম এ. শেল্‌ডন মানবশরীরের গড়নকে তিনটি প্রধান ধরণে ভাগ করেছেন, যেমন — মেসোমর্ফ বা পেশীবহুল, পরিশ্রমী গড়ন; এক্‌টোমর্ফ বা ক্ষীণ, দুর্বল গড়ন এবং এন্ডোমর্ফ বা থল্‌থলে, মাংসল গড়ন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল মেসোমর্ফদের মধ্যেই অপরাধ প্রবণতা বেশি। পরবর্তীকালে গ্লুয়েক ও গ্লুয়েকসহ অন্যান্য গবেষকরাও দেহকাঠামো এবং অপরাধের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জীববৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নানাদিক থেকে সমালোচিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অত্যন্ত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তগুলি গড়ে উঠেছে। ফলে, পরবর্তী কালের গবেষণায় ওই সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তিহীন এবং পক্ষপাতমূলক বলে মনে করা হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা — বিচ্যুতি ও অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ্ সিগমন্ড ফ্রয়েডের পরোক্ষ অবদান বলা যেতে পারে। এই তত্ত্বের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, মানুষের অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ হল ব্যক্তিত্বের বিশেষ ধরণ। ফ্রয়েড নিজে মনস্তত্ত্বের বিষয়ে আলোকপাত করলেও, বিচ্যুতি বা অপরাধ বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেন নি। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তীকালে অপরাধ-গবেষণাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে মনে করা হয়েছে অপরিণত মন ও বিকৃত ব্যক্তিত্বের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে যাঁদের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন অঁরি গদ্দার্দ (১৯২০), উইলিয়াম হিলী (১৯১৫), অগাস্ট সাইকর্ন (১৯৩৬), কেট

ফ্রীডল্যান্ডার (১৯৪৯) প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ। সমালোচকেরা অবশ্য মনে করেন যে অল্প কিছু সংখ্যক অপরাধীর মনের গঠন নিরপরাধ ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন হলেও সকলের ব্যক্তিত্বই যে বিকৃত হবে এমন মনে করার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। আবার, যারা দলবেঁধে অপরাধ করে আর যে একা কোনো সঙ্গী ছাড়াই অপরাধ করে, যে বেপরোয়া খুন, জখম, মারামারিতে অভ্যস্ত এবং যে ঠাণ্ডা মাথায় প্রতারণা, জালিয়াতি, জুয়াচুরির মত অপরাধ করে তাদের সকলের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা একই ধরণের হতে পারে না। এই সমস্ত কারণে অপরাধ বা বিচ্যুতির ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্ভরতা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমূহ — বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই সমাজতাত্ত্বিকগণ অপরাধের উৎস সন্ধান করতে শুরু করেন সমাজজীবনের অভ্যন্তরে। ১৯৩০-র দশকে মুখ্যতঃ আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ব্যক্তি তার দৈহিক বা মানসিক কারণে নয়, সমাজের কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। অপরাধের সামাজিক কারণগুলির এই বিশ্লেষণই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রূপে পরিচিত। সাধারণভাবে অপরাধকে নেতিবাচক ঘটনারূপে গণ্য করা হলেও, এমিল দ্যুর্খেম, যিনি প্রথম অপরাধকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন (১৮৯৩), তিনি কিন্তু এর সদর্থক ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় অপরাধ কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই অপরাধের সন্ধান পাওয়া যায় এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার সূত্রে সমাজের বিবেকবোধ জাগ্রত ও উজ্জীবিত হয়, সামাজিক সংহতি দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই কারণে সমাজে অপরাধ ও বিচ্যুতির বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান।

১৯৩০-র দশকের পর থেকে যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক অপরাধের কার্য-কারণ ইত্যাদিকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শিকাগো গোষ্ঠীর অপরাধ সমাজতাত্ত্বিকগণ, যাঁরা আমেরিকার শহর জীবন, বিশেষত শিকাগো শহরের প্রেক্ষাপটে অপরাধকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; এডুইন সাদারল্যান্ড—যিনি সঙ্গী-সংসর্গের সূত্রে অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন, রবার্ট মার্টন ও তাঁর স্ট্রেইন (চাপ) থিওরি, অ্যালবার্ট কোহেন এবং সংস্কৃতির ধারণা; রিচার্ড ক্লোয়ার্ড এবং লয়েড ওহলিনের অপরাধী উপসংস্কৃতির বক্তব্য, ডেভিড মাট্‌জা এবং সাইক্‌সের দোলাচলতার তত্ত্ব ইত্যাদি। ১৯৬০-র দশকে আলোড়ন তুলেছিল হাওয়ার্ড বেকারের লেবেলিং থিওরি। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে আমরা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবো সাদারল্যান্ড, মার্টন, ক্লোয়ার্ড ও ওহ্‌লিনের বক্তব্যসহ লেবেলিং থিওরির যুক্তিগুলিকে ।

এডুইন সাদারল্যান্ডের ডিফারেনসিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্ব — ডিফারেনশিয়াল অ্যাসোসিয়েশান তথা অপরাধীদের উপর সংসর্গের প্রভাবের ধারণার সঙ্গে সাদারল্যান্ডের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও এ বিষয়ে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন শ' এবং ম্যাকের বক্তব্য দ্বারা। এই দুই গবেষক ১৯৩৮ সালেই লক্ষ্য করেছিলেন যে কিশোর অপরাধীরা হয় পরিবারের মধ্যে বড়ো ভাই-বোন বা পরিবারের বাইরে সঙ্গীসাথীদের প্রভাবে অপরাধের পথে পা বাড়ায়। এই গবেষণার প্রভাবেই প্রথমে ১৯৩৯-এ এবং পরে (১৯৪৭) আরও বিস্তারিত ভাবে সাদারল্যান্ড তাঁর ডিফারেনশিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অপরাধ-প্রবণতা কোনো জন্মগত বিষয় নয়, মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে অপরাধের প্রতি সদর্থক মনোভাব এবং অপরাধের

কলাকৌশল শিখে অপরাধী হয়ে ওঠে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি পরিচিত হয়েছে 'ডিফারেনশিয়াল অ্যাসোসিয়েশন' বা ভিন্ন ধরণের সংসর্গ নামে। সাদারল্যান্ড মনে করেন, জীবনে চলার পথে মানুষ নানা জনের সংস্পর্শে আসে, তাদের কেউ আইন মেনে সৎ পথে চলে, আবার কেউ কেউ আইনবিরোধী হওয়াকে দোষের মনে করে না। এই ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে যেটি ব্যক্তির উপর বেশি প্রভাব ফেলবে, ব্যক্তি সেটিই বেছে নিতে অভ্যস্ত হবে। সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন অংশে, যেমন বস্তি-অঞ্চলে, অপরাধ-প্রবণতার আধিক্য দেখা দেয় — কারণ সেখানে দুষ্কৃতীপরায়ণ মানুষের সংখ্যা বেশি, বেপরোয়া, বেআইনি কাজের সম্ভাবনাও বেশি; ফলে সেখানে অপরাধ-প্রবণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও তুলনামূলক অধিক। ১৯৪৭ সালে সাদারল্যান্ড যখন তাঁর তত্ত্বটিকে আরও বিস্তৃত রূপ দেন তখন সংসর্গ ও অপরাধের সম্পর্ককে নয়টি যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। এগুলি হল —

১। মানুষ অপরাধমূলক আচরণ অন্যের কাছ থেকে শেখে।

২। পারস্পরিক আচরণের সূত্রে স্পষ্ট নির্দেশের মধ্য দিয়ে অপরাধমূলক আচরণ শেখার কাজটি ঘটে।

৩। এই শেখার অধিকাংশটি ঘটে ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত বৃত্তের পরিসরে।

৪। কোনো ব্যক্তির যখন অপরাধে হাতেখড়ি হয় তখন সে

(ক) অপরাধের সরল, জটিল সব রকমের কলা-কৌশল শেখে; এর সঙ্গে

(খ) অপরাধের উদ্দেশ্য, আগ্রহ, অপরাধের সমর্থনে যুক্তি, অপরাধী মনোবৃত্তি ইত্যাদি সবই আত্মস্থ করে।

৫। আইনকে স্বার্থ সহায়ক বা স্বার্থ-বিরোধী যেভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তার ভিত্তিতে বিশেষ উদ্দেশ্য, প্রবণতা ইত্যাদি শেখা হয়।

৬। যখন কেউ আইনভঙ্গের বিষয়টিকে নিন্দনীয় মনে করার পরিবর্তে বিশেষ ভাবে সমর্থন করে তখনই সে অপরাধী হয়ে ওঠে। এটাই হল ভিন্নধর্মী সংসর্গের নীতি।

৭। ভিন্নধর্মী সংসর্গ স্থায়িত্ব, তীব্রতা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র হতে পারে।

৮। অন্য যে কোনো বিষয় যে প্রক্রিয়ায় শেখা হয়, অপরাধমূলক আচরণও সেই একই প্রক্রিয়ায় অপরাধমূলক বা অপরাধবিমুখ আচরণের সংস্পর্শে শেখা হয়।

৯। অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে যেসব সাধারণ প্রয়োজন ও মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে, অপরাধ-মুক্ত আচরণও সেই একই প্রয়োজন ও মূল্যবোধকে প্রকাশ করে, সেহেতু ওই প্রয়োজন এবং মূল্যবোধকে নিছক অপরাধমূলক আচরণের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অপরাধ প্রসঙ্গে সাদারল্যান্ডের এই বক্তব্যগুলিকে অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে জীববৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব অপরাধীদের যে দেহ-মনের বিকৃতি ও বিকারসম্পন্ন ছবি তুলে ধরেছে, প্রকৃত পরিস্থিতি কিন্তু তা নয়। অপরাধী এবং নিরপরাধ — এদের মধ্যে আসলে শারীরিক বা মানসিক কোনো পার্থক্য নেই; পার্থক্য

রয়েছে তাদের পরিবেশ ও শিক্ষার সুযোগের মধ্যে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কেউ সুস্থ জীবনের মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ পায়, আবার কারোর বা বস্তির দূষিত পরিবেশে নেশা ও অপরাধে হাতে খড়ি হয়। ব্যক্তি যে ধরণের অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে (যেমন, চোর, পকেটমার, ঠগ, ডাকাত) সেই ধরণের অপরাধই করতে শেখে।

শ' ও ম্যাকের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভবিত হলেও সাদারল্যান্ড তাঁর তত্ত্বকে কেবলমাত্র বস্তির ছেলেদের অপরাধীর ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এটিকে তিনি সমস্ত ধরণের অপরাধের বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল সংসর্গের প্রভাবে কেবলমাত্র অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত মানুষই অপরাধপ্রবণ হয় না। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষও নানা ধরণের অর্থনৈতিক বা পেশাকেন্দ্রিক অপরাধ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ধরণের অপরাধের নাম দিয়েছেন 'হোয়াইট কলার ক্রাইম'। ব্যবসা, পেশা, রাজনীতির ক্ষেত্রেও বেআইনি কাজ-কারবার যে কিছু কম হয় না এ বিষয়ে 'সাদারল্যান্ডই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎকালীন প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে তিনি প্রথম বলেন যে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পেশাজীবী মানুষদের অপরাধ প্রমাণ করে যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বস্তির পরিবেশ, অসুস্থ পারিবারিক পরিস্থিতি, মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদি অপরাধের একমাত্র নির্ধারক নয়।

রবার্ট মার্টনের স্ট্রেইন থিওরি — হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, প্রথিতযশা অধ্যাপক, মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মার্টনের 'স্ট্রেইন থিওরি' বা সামাজিক চাপের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে, Social Structure and Anomie নামের একটি দশ-পাতার প্রবন্ধে। অনেক পরে অবশ্য তিনি এটিকে বারবার করে পরিমার্জনা করেছেন। ৩০'র দশকের তত্ত্ব হলেও এটি স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পায় ১৯৬০-র দশকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, 'অ্যানোমি' বা নীতিহীনতার সঙ্গে সমাজে বিচ্যুতি, সংহতি হীনতার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে কথা প্রথম বলেছিলেন দ্যুর্খেম (১৮৯৩)। তিনি মনে করেন যে শিল্পোন্নত সমাজ সহ যেখানে শ্রমবিভাজন, প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা যথেষ্ট বেশি, সেখানে বিচ্যুতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ সেখানে সমাজে সংহতি এবং সাযুজ্য অতীতের মত থাকে না। দ্যুর্খেম আত্মহত্যার প্রসঙ্গে অসংহতি, বিচ্যুতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আনলেও মার্টন কিন্তু অপরাধসংক্রান্ত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে নীতিহীনতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেন যে কোনো সমাজের প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত মূল্যবোধ তথা সংস্কৃতি সদস্যদের সামনে জীবনের কাম্য লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যগুলির পূরণের উপায় সমূহকে তুলে ধরে। সমাজ-সদস্যরা অধিকাংশই সেই লক্ষ্যকে অর্জন করতে আগ্রহী হলেও, লক্ষ্যপূরণের সমাজ-অনুমোদিত উপায় সকলের কাছে সহজলভ্য হয় না। সমাজ কাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই উপায়গুলির পথে আংশিক বা পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলে। লক্ষ্য অর্জনের আগ্রহে ব্যক্তি তখন অনুমোদনহীন বা বেআইনি পদ্ধতিতে কাজ করে।

মার্টনের মতে মার্কিন সমাজে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পায় আর্থিক সাফল্য। ধনী ও অতি-ধনী সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান থেকে শুরু করে বস্তিবাসী, দরিদ্র, অর্ধশিক্ষিত, স্কুলছুট, অমার্জিত — সবার কাছেই এই সাফল্যের হাতছানি যথেষ্ট প্রবল। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানের জন্য সাফল্যের সুযোগ সকলে সমান

ভাবে পান না কারণ উচ্চশিক্ষা, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি, ভদ্রস্থ জীবিকা ইত্যাদি সকলের নাগালের মধ্যে থাকে না। অথচ সকলেই বিশ্বাস করেন যে পরিশ্রম জীবনে সাফল্য এনে দিতে পারে — এই সাফল্য হল আর্থিক সাফল্য। এই সাফল্যের আকর্ষণ তথা প্রলোভন থেকেই জন্ম নেয় অপরাধপ্রবণতা। যারা শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক-পারিবারিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের সামনে সমাজস্বীকৃত সাফল্যের ধারণা এবং সমাজকাঠামো প্রদত্ত বৈধ সুযোগ-সুবিধা এই দুইয়ের এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এক চাপ বা strain, যদিও চাপের প্রভাব সকলের উপর সমান হয় না, সবাই সমানভাবে চাপের মোকাবিলাও করতে পারে না বা করে না। মার্টন এই চাপের পাঁচটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেছেন এবং চাপ ও পরিণতির সম্পর্ককে একটি ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

চাপ মোকাবিলার ধরণ	সমাজস্বীকৃত লক্ষ্য	বৈধ উপায়
১। Conformity/বৈধ ব্যবস্থার প্রতি মান্যতা	+ (স্বীকৃত লক্ষ্যের অনুসরণ)	+ বৈধ উপায় অবলম্বন)
২। Innovation / উদ্ভাবন	+	– (বৈধ উপায় বর্জন)
৩। Ritualism / লক্ষ্যের বর্জন, বৈধ উপায় অনুসরণ	— (লক্ষ্য মাত্রার অবনমন)	+
৪। Retreatism / জীবন বিমুখতা	— (স্বীকৃত লক্ষ্য-বর্জন, মদ্যাসক্তি, মাদকাসক্তি)	—
৫। Rebellion / বিদ্রোহ	+ (প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যের বর্জন, — নতুন লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা)	+ (বৈধ উপায় বর্জন, স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন)

মার্টন মনে করেন অধিকাংশ মানুষই সফল হোন বা না হোন, আইন মান্য করে চলেন। কিন্তু কারোর কারোর কাছে লক্ষ্য ও উপায়ের ব্যবধান অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন তারা লক্ষ্য বা সুযোগের কোনো একটিকে বা দুটিকেই পাল্টাতে চায় এবং তখনই তারা সমাজস্বীকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির দেহ-মনের মধ্যে নয়, মার্টন অপরাধের কারণ খুঁজেছেন সমাজের অভ্যন্তরে। অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে ১৯৫০-'৬০-এর দশক থেকে।

ডিফারেনশিয়াল অপরচুনিটি বা ভিন্নধর্মী সুযোগের তত্ত্ব — ১৯৬০-র দশকে সাদারল্যান্ড এবং মার্টনের অপরাধতত্ত্বের সমন্বয়ে নতুন একটি তাত্ত্বিক ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন দুই আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক ক্লোয়ার্ড এবং ওহ্‌লিন। তাঁদের গ্রন্থ 'ডেলিংকোয়েন্সি অ্যান্ড অপরচুনিটি'তে (১৯৬০) বৈধ এবং অবৈধ উভয় সুযোগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যক্তি কি ভাবে অপরাধমূলক আচরণে প্রবৃত্ত হয় তার একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য হল, ব্যক্তির সামনে বৈধ এবং অবৈধ উভয় ধরণের সুযোগই বর্তমান থাকে; কিন্তু অবৈধ সুযোগ অপেক্ষাকৃত

সহজলভ্য হওয়ায় ব্যক্তি তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের বৈধ উপায়গুলি থাকে অপেক্ষাকৃত সীমিত, ফলে ব্যক্তির মনে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সে অবৈধ পথগুলিকে আশ্রয় করে। যদি তার সামনে এই পথগুলি উন্মুক্ত না থাকত তবে সেগুলিকে অবলম্বন করার কথা সে কখনোই ভাবতো না ক্লোয়ার্ড ও ওহ্‌লিনের এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় নজরে আসে। যেমন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাই, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি, সমাজের প্রধান স্বীকৃত লক্ষ্যরূপে পরিচিত হয়। ফলে এই লক্ষ্যগুলিকে অর্জনের বিভিন্ন বৈধ পদ্ধতি সমাজে অনুমোদিত হয়। কিন্তু এগুলি সমাজের সর্বস্তরের কাছে সমান সহজলভ্য থাকে না, বিপরীতভাবে অবৈধ উপায়গুলি অনেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কাছে উন্মুক্ত থাকতে পারে, বা না-ও থাকতে পারে। প্রসঙ্গত ক্লোয়ার্ড এবং ওহ্‌লিন সমাজে সচরাচর প্রচলিত তিন ধরণের অপরাধ উপসংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন, এই উপসংস্কৃতিগুলি মানুষকে অপরাধে প্ররোচনা দেয়। এগুলি হল —অপরাধী উপসংস্কৃতি (ক্রিমিন্যাল সাব্‌কালচার); সংঘাতমুখী উপসংস্কৃতি (কনফ্লিক্ট সাব্‌কালচার) এবং জীবনবিমুখ উপসংস্কৃতি (রিট্রিটিস্ট সাব্‌কালচার)। প্রথম ধরণের উপসংস্কৃতিতে অবৈধ পথে পয়সা রোজগারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবিত্ত পরিবেশে যদি খুব ধনী ও প্রভাবশালী কোনো দুষ্কৃতির বসবাস থাকে তবে সে অনেক সময়েই স্থানীয় তরুণদের 'রোল মডেল' বা আদর্শ হয়ে ওঠে কারণ এসব অল্পবয়সীদের সামনে অন্য কোনো অনুকরণযোগ্য 'মডেল' থাকে না। বস্তির পরিবেশে অনেক সময়েই অপরাধের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে, স্থানীয় মদতে অল্পবয়সীরা সহজেই অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পরিবেশে অপরাধপ্রবণতা জীবনের স্বাভাবিক সঙ্গে পরিণত হয়।

সংঘাতমুখী উপসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায় সমাজের সেই সমস্ত অংশে যেখানে অপরাধকে সমাজে স্বীকৃতি পাবার অন্যতম উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়। হিংসাপ্রবণ পরিবেশে অল্পবয়সীদের মারামারি, গুণ্ডামি প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আসলে, যারা গায়ের জোর দেখানো, গুণ্ডামি ইত্যাদির উপর ভর করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে চায়, তারা আসলে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যর্থ মানুষ; নিজেদের ব্যর্থতার যন্ত্রণাকে আড়াল করার জন্যই তারা হিংসার আশ্রয় নেয়।

জীবনবিমুখ উপসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় ড্রাগ বা মাদক সেবনকারীদের মধ্যে। যে সমস্ত এলাকায় পুলিশের কঠোর নজরদারী ও দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে রাস্তায় গুণ্ডামি, মারামারি ইত্যদি সম্ভব হয় না, অথবা হিংসাবিরোধী পরিবেশ বজায় থাকে, সেখানে সুস্থ জীবন অথবা অপরাধপ্রবণ জীবন কোনোটাকেই অবলম্বন করতে না পেরে অল্পবয়সীরা অনেক সময়েই মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে অবশ্য এই জাতীয় সিদ্ধান্তকে অতি সরলীকৃত বলে মনে করেছেন।

লেবেলিং থিওরি — 'লেবেলিং' বা কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী চিহ্নিত করার স্থায়ী ফলাফলের কথা প্রথমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন ফ্র্যাংক টেনেনব্যম, ১৯৩৮ সালে। ১৯৬২-তে জন কিৎসইউস এবং কাই এরিকসনও অপরাধ প্রসঙ্গে সোস্যাল রিঅ্যাকশান বা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু লেবেলিং থিওরির প্রধান প্রবক্তারূপে যিনি পরিচিত তিনি হলেন হাওয়ার্ড বেকার। ১৯৬৩ সালে Outsiders : Studies in

the Sociology of Deviance গ্রন্থে তিনি কেন সমাজে কিছু মানুষ অপরাধী হিসেবে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয় সে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। বেকার লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজে অনেকেই একই ধরণের আচরণ করলেও কিছু লোক দোষী সাব্যস্ত হয়, কিছু মানুষ নয়। এর আসল কারণ হল সমাজ ওই মানুষদের ওই ভাবেই দেখে; ফলে তাদের ক্ষেত্রে 'অপরাধী' এই পরিচয়টি স্থায়ী হয়ে যায়। বেকার মনে করেন যে, সমাজের দৃষ্টিতে তারাই অপরাধী যারা সেভাবে চিহ্নিত হয়। বক্তব্যটির সত্যতা নিরূপণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক গবেষণা করা হয়েছে; প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একাধিক জন একই রকম আচরণ করলেও, কাউকে অপরাধী এবং কাউকে নিরপরাধ গণ্য করা হয়। এই 'অপরাধী' লেবেল তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বাধা দেয়। লেবেলিং থিওরি কিন্তু কোনো একটি একক ধারণা নয়, এটি হল অনেকগুলি ধারণার সংমিশ্রণ। এই তত্ত্বের অন্যতম বক্তব্য হ'ল দুষ্কার্যের প্রকৃতিকে বোঝার জন্য প্রথমে বুঝতে হবে কেন কিছু কিছু লোককে 'অপরাধী'র তকমা বা এক অদৃশ্য লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয়। আইন অথবা নৈতিকতার রক্ষক রূপে যাঁরা সমাজে পরিচিত তাঁরাই 'লেবেলিং' বা চিহ্নিতকরণের কাজটি করেন। সাধারণত, মহিলাদের, দরিদ্রদের, অল্পবয়সীদের এবং সংখ্যালঘু জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষদেরই অপরাধীরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই সমগ্র ব্যবস্থাটির মধ্য দিয়ে সহজেই সমাজের ক্ষমতা কাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'অপরাধী' রূপে চিহ্নিত মানুষগুলি আদতে যাই হোন বা কেন, সমাজে তাদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ক্রমশই অপরাধ জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তবে, চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অপরাধই মূল শর্ত নয়, অনেক সময়ে অপরাধের সঙ্গে সংস্পর্শহীন ব্যক্তি তার জাত, ধর্ম, গাত্রবর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি লেবেলিং বা চিহ্নিত করণে সাহায্য করে। অপরাধী নির্ণিত হলে শাস্তিস্বরূপ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়; 'সাজা-প্রাপ্ত' এই পরিচয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপরাধের পথে ঠেলে দেয়, সুস্থ জীবনে ফিরে আসার সব পথগুলি তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, সমাজ তাদের অবিশ্বাস করতে থাকে। আইন, আদালত, পুলিশ, জেল ইত্যাদির সাহায্যে ক্ষমতাশালীরাই স্থির করেন কোন্‌টি অপরাধ, কোন্‌টি নয়; কে অপরাধী এবং কে নয়। এই তত্ত্বে লেবেলিং বা চিহ্নিতকরণকে অপরাধের মূল কারণ বলা হলেও লেবেলিংয়ের জন্যই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এমন কথা বলা যায় না।

বিচ্যুতির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য হল শারীরিক বা মানসিক গড়নের মতো পূর্বনির্ধারিত কারণগুলির অযৌক্তিকতা খণ্ডন করে বিচ্যুতি ও অপরাধের পিছনে সমাজের প্রভাব তুলে ধরা। তত্ত্বগুলি ত্রুটিহীন না হ'লেও এগুলি বিচ্যুতির বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উপসংহার — সমাজ এবং ব্যক্তির সম্পর্ক পারস্পরিক। ব্যক্তির জীবনে সমাজ অপরিহার্য, কারণ সমাজের প্রভাবেই ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থপূর্ণ এবং সফল হয়ে ওঠে; সমষ্টিবদ্ধ জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে চলতে শেখে সে। সমাজের এই প্রভাবের প্রকাশ ঘটে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এর সূত্রে সে নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আচরণরীতি, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে; তার আত্মসত্ত্বার বিকাশ ঘটে এবং সমষ্টির প্রভাবে ব্যক্তির সমাজ অনুমোদিত পরিচয় গড়ে ওঠে। তবে, ব্যক্তি ও সমাজের এই সম্পর্ক কখনই একমুখী নয়, কারণ, ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন অভিমত, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদিও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তি ও সমাজের এই সম্পর্ক যে সব সময়েই সরল বা সমস্যামুক্ত থাকে, তা' নয়। অধিকাংশ মানুষই সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নিয়ম, সমাজ-অনুমোদিত লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণের পথগুলিকে সম্মান করে চললেও, কোনো কোনো সদস্যের মধ্যে এগুলিকে উপেক্ষা করার প্রবণতাও প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে ঘটে 'বিচ্যুতি' বা অপরাধ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজে 'বিচ্যুতি'র সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য গড়ে উঠেছে নানা ধরণের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা। বিচ্যুতির সমস্যাকে সঠিক উপলব্ধির জন্য এর নানাবিধ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও গড়ে উঠেছে। এই ব্যাখ্যাগুলি বিচ্যুতি, অপরাধ, সমাজের ভূমিকা ইত্যাদিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আলোচ্য মডিউলটি সমাজ ব্যবস্থার তথা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের প্রাথমিক সূত্রগুলিকে চিনতে ও বুঝতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন — প্রতিটি ৬ নম্বর

ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝ?

খ) আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি?

গ) অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাকে বলে?

ঘ) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমরূপে আইনের পরিচয় দাও।

ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার গুরুত্ব কি?

চ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও জনমতের সম্পর্ক কি?

ছ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণে প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচারের ভূমিকা কি?

জ) বিচ্যুতি কি?

ঝ) বিচ্যুতির কারণগুলি কি কি?

ঞ) বিচ্যুতির জীববৈজ্ঞানিক / মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিচয় দাও।

ট) দুষ্কৃতি উপসংস্কৃতির তত্ত্ব কি?

২। **১২ নম্বরের প্রশ্ন**

ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দাও। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনা কর।

খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমরূপে আইন ও শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা কর।

গ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণে জনমতের বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ) আধুনিক সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

ঙ) বিচ্যুতি বলতে কি বোঝ? বিচ্যুতির ব্যাখ্যায় ডিফারেনশিয়াল অ্যাসোসিয়েশন তত্ত্ব ও আর্টনের অ্যানোমি তত্ত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

চ) লেবেলিং থিওরির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। **বিশ্লেষণধর্মী বৃহৎ প্রশ্ন ঃ— প্রতিটি ২০ নম্বরের**

ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

খ) বিচ্যুতির জীববৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিচয় দাও।

গ) বিচ্যুতির প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলির পরিচয় দাও।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ— **Reference :—**

1.	Gisbirt, Pascal	-	2011	Fundamentals of Sociology	Orient Black Swan
2.	Oxford Dictionary of Sociology	-	2004	Oxford University Preses	
3.	Haralambos, M.with	-	1994	Sociology Themes and Perspectives	OUP
4.	Giddens, Anthony	-	1993	Sociology	Polity Press
5.	Maciver R.M. & Page Charles H.	-	1990	Society : An Introductory Analysis	Macmillan India Ltd.
6.	Lilly J.R., Culleu. F.T. Ball R. A.	-	1989	Criminological Theory Context and Consequences	Sage
7.	Bottomore T. B.	-	1962	Sociology	George Allen & Unwin Ltd.